স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ২৬ ডিসেম্বর - ২০১১, ১০ পৌষ - ১৪১৮।। দাম : পাঁচ টাকা

অগ্নিগ্রাসে রাজ্যের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

বিষমদে ক্ষতিপূরণ : মুসলিম তোষণেই পরোক্ষে সমর্থন নয় কি? ❑ ৮

আমরি কর্তাদের সঙ্গে সিপিএমের লেনদেন ছিল বরাবরই ❑ ৯

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর এখন সরে যাওয়াই উচিত ❑ তারক সাহা ❑ ১১

চীনের বিরুদ্ধে দাবার ঘুঁটি সাজাতে হবে ❑ অশোক কুমার মেহতা ❑ ১৩

আমরি কাণ্ডে এরাজ্যে বেসরকারি চিকিৎসার বাণিজ্যিকিকরণের নগ্ন রূপটাই ফুটে উঠেছে ❑ অর্ণব নাগ ❑ ১৫

এরাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আজ নিজেই অসুস্থ ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ১৭

সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিপীড়িত মহিলাদের ব্যাপারে সবাই চুপ কেন? ❑ ২০

খোলা চিঠি : টানাটানির টাকায় ভাগাভাগির রাজনীতি ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২১

যীশু কি বুদ্ধদেবের অনুগামী ছিলেন? ❑ অম্লানকুসুম ঘোষ ❑ ২৪

অভূতপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর অঙ্গনাদের ❑ মিতা রায় ❑ ২৭

ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রাপ্তি শুধু রঞ্জন সোধী ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৩১

বীর সাভারকরের মুক্তি : বাজারি লেখকের কুৎসা কুযুক্তি ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অগ্নিগ্রাসে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা
— পৃঃ ১৫-১৭

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৯** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑

বোধন : ২৫ ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-২৯** ❑ **শব্দরূপ : ৩২**

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১০ পৌষ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৬ ডিসেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের সহৃদয় পাঠকদের জানাচ্ছি, গত কয়েক মাসে নিউজপ্রিন্টের দাম এবং কাগজ ছাপার আনুষঙ্গিক খরচ যেভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তাতে বর্তমান মূল্যে স্বস্তিকা আপনাদের হাতে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়েই আগামী ২৩ জানুয়ারি (৬৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা) সংখ্যা থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার দাম ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩২৫ টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার এই আর্থিক সংকটময় মুহূর্তে পাঠকবর্গের একান্ত সহযোগিতা আমাদের একমাত্র কাম্য। বিগত ৬৪ বছর ধরে আপনাদের সহৃদয় চিত্তের যে প্রেরণা স্বস্তিকা-কে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না— এই প্রত্যাশা রইল।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : সীমান্তে সংকট

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গো-পাচার, নারী-পাচার, অস্ত্রশস্ত্র পাচার নতুন কিছু নয়। কিন্তু ইদানীং তা লাগামছাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সুপরিকল্পিতভাবে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বি এস এফ) ওপর চাপ সৃষ্টির গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। যার ফলে দেশের সার্বভৌমত্বই আজ সংকটের মুখে। আলোচনা করেছেন— **সাধন কুমার পাল ও তরুণ কুমার পণ্ডিত।**

সঙ্গে থাকছে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়।

সম্পাদকীয়

হিন্দু সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নির্যাতন

পাঞ্জাবের অম্বালা জেল হইতে ২০১১-র ২৬ নভেম্বরে স্বামী অসীমানন্দের মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো চিঠিটি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই চিঠিতে তাঁর বন্দী জীবনে সরকারি দুই সংস্থা সি বি আই এবং এন আই এ-র রোমহর্ষক অত্যাচারের যে কথা তিনি লিখিয়াছেন, তাহা জানিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। চিঠির বয়ান অনুসারে বিবস্ত্র করিয়া পা উপর দিকে ও মাথা নীচের দিকে করিয়া অত্যাচারের ভয় দেখানো হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, হুগলী হইতে তাঁহার মা-কে আনাইয়া তাঁহারই সম্মুখে অত্যাচার করিবার মতো বীভৎস কথাও শোনানো হইয়াছে। স্বামী অসীমানন্দ একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। হিন্দু সমাজের সার্বিক কল্যাণে তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। খৃস্টান ধর্মান্তরিত বনবাসীদের তিনি পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাই এই দেশের শাসককুলের খৃস্টান ধর্মাবলম্বী শীর্ষ নেতাদের আঁতে ঘা লাগিয়াছে। বিশেষত ভ্যাটিকান হইতে মহামান্য পোপ এই দেশে আসিয়া যখন ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে এই তৃতীয় শতাব্দীতে এশিয়া মহাদেশেই হইবে তাঁহাদের টার্গেট। তাই 'প্রথমে কুকুরটির বদনাম করো এবং পরে মারিয়া ফেল' বলিয়া যে কথাটি প্রচলিত আছে, এইক্ষেত্রে তাহাই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই সূত্রেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম গৈরিক সন্ত্রাস-এর তত্ত্ব আমদানী করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত পত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে সি বি আই, এন আই এ এবং এ টি এস-এর অফিসারেরা মক্কা মসজিদ, সমঝোতা এক্সপ্রেস ও আজমেঢ়-এ বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। এক বৎসরেরও বেশি সময় ধরিয়া তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য বহুবার বিভিন্ন আদালত, জেল ও শহরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মিথ্যা বক্তব্য ও মনগড়া অভিযোগ স্বীকার করিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেইসব বক্তব্যকে জোর করিয়া স্বীকারোক্তি বলিয়া তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং সংবাদমাধ্যমে তাহা প্রকাশ করিয়া শুধু একজন হিন্দু সন্ন্যাসীকেই নয়, একইসঙ্গে দেশভক্ত হিন্দু সংগঠন তথা সমগ্র হিন্দু সমাজকে অপমান করা হইয়াছে।

অন্যদিকে জোর করিয়া আদায় করা তাঁহার স্বীকারোক্তিকে ভিত্তি করিয়া মালেগাঁও মামলায় অভিযুক্ত পাঁচজন মুসলিমকে জামিন দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুসমাজকে কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যেই গত কিছুদিন ধরিয়া কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং, চিদাম্বরম প্রমুখ ইউপিএ নেতা বিবৃতি দিয়া চলিয়াছেন। সন্ত্রাসবাদ প্রসারে দায়ী করিয়া হিন্দু সংগঠনগুলিকে পরিকল্পিতভাবে লাঞ্ছিত করা হইতেছে।

প্রশ্ন হইল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোন অধিকারে এন আই এ-কে মালেগাঁও মামলায় অভিযুক্ত পাঁচ মুসলিমের জামিনের আবেদনের বিরুদ্ধাচরণ না করিবার নির্দেশ দেন? এন আই এ কি নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থা হিসাবে কাজ করিবে, না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে চলিবে? দ্বিতীয়ত, কোনও আদালতই যখন স্বামী অসীমানন্দের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের অনুরোধ লইয়া কোনও রায় দেয় নাই অর্থাৎ যাহা বিচারাধীন, তাহার ভিত্তিতে মালেগাঁও অভিযুক্তদের কেমন করিয়া জামিন দেওয়া হইল? তৃতীয়ত, এন আই এ এই জামিনের আইন কিভাবে সমর্থন করিল যখন ভারত সরকার আমেরিকা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণে লস্কর-এ-তৈবা এবং হুজির মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হাত আছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে।

ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, হিন্দু হওয়ার কারণে স্বামী অসীমানন্দকে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে। ন্যূনতম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হইতেছে। আফজল গুরু বা কাসভের মতো সন্ত্রাসবাদীদের জন্য মানবাধিকারবাদীরা কাঁদিয়া বুক ভাসান, এখন তাঁহারা চুপ কেন? কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আদায় করিবার জন্যই কি এইসব নৃশংস সন্ত্রাসবাদীর শাস্তিদানে বিলম্ব করা হইতেছে? মানবাধিকারবাদীরা নীরব কেন? এই ভণ্ডামি আর কতদিন চলিবে?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত পদ্ধতিগুলির সঙ্গে আমার একটুও আত্মীয়তা নেই, যদিও ইউরোপে ওইগুলির ফল ভাল করা গেছে। ভারতের নিজস্ব প্রকৃতি, পদ্ধতি ও স্বভাব আছে। তার প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের মৌলিক পথ অবলম্বন করতে হবে। আমাদের ইউরোপের পথ অনুসরণ করার কিঞ্চিৎমাত্র প্রয়োজন নেই। তার কারণ ওই দেশগুলি তো এই সেদিন মাত্র জন্মেছে আর নিজেদের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের অনুসরণ করলে সমাজকে হোঁচট খেতে হবে।

—শ্রীঅরবিন্দ

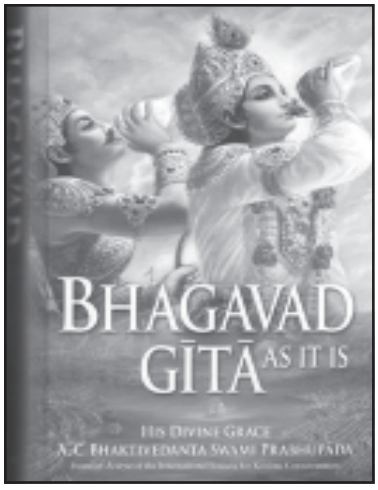

রাশিয়ার আদালতে মামলা

গীতা যুদ্ধে উস্কানি দেয়?

আপত্তিকে উপেক্ষা করে কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে, গীতা তা অত্যন্ত সহজে ও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়। গীতাতে অনেক বিষয়েই বলা হয়েছে এবং

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি রাশিয়ার সাইবেরিয়ার আদালত ভগবদ্ গীতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে— এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও রাশিয়ার আদালত এই রায়কে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে বলে জানা গেছে। ইস্কনের স্থানীয় শাখা প্রচারিত গীতা সংস্করণটির ভিত্তিতে আদালতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে গ্রন্থটি 'যুদ্ধের পক্ষে ওকালতি' করে এবং এটি একটি চরমপন্থী সাহিত্য (এক্সট্রিমিস্ট লিটারেচার) যা রাশিয়ার সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগের। রাশিয়ায় গীতা নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদে ভারতীয় সংসদ উত্তাল হয়ে উঠে। দু-দুবার লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। পরে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেছে, রাশিয়া এজন্য ভারতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

গীতা-কে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে রাশিয়ার ইতিহাসবিদ মাধবন পালট বলেছেন, ''এই নিষেধাজ্ঞা উত্তর-রাশিয়ার (সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর) উদ্বেগেরই দর্পণ বা প্রকাশ। রাশিয়া এখন মনে করলেই সবকিছু করতে পারে না।... যখন বৃহৎ শক্তিকে আঘাত করার ক্ষমতা ধরে না, তখন ক্ষুদ্রকেই আঘাত করে।''

সম্প্রতি দিল্লী মেট্রো-র বিদায়ী প্রধান ই শ্রীধরন এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন, গীতা প্রকৃতপক্ষে 'প্রশাসকদের হ্যান্ডবুক' (অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস হ্যান্ডবুক)। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক, কামনা-বাসনা ও ভয়ের বিষয়ে ওজর-বিভিন্নজন তাঁর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও করতে পারে। কিন্তু তা বলে গীতা-কে 'চরমপন্থী সাহিত্য' বলা হবে?

মহাভারতে 'ভগবদ্ গীতা' সংকলিত হয়েছে। যেখানে আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে ভেবে ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুর কথা ভেবে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, নৈতিক মূল্যবোধ ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাকে যুদ্ধ করতে হবে--- আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক, ভয় বা গর্বের কারণে নয় যা আমরা জীবনযুদ্ধে বরাবর করে চলেছি। যে কৃষ্ণ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য 'রণছোড়জী' নামে খ্যাত, তিনি শারীরিক সংঘর্ষের জন্য উৎসাহ দেবেন, এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? আসলে জীবনের মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে এবং সত্যানুসন্ধানের জন্য তিনি 'যুদ্ধ'-এর কথা বলেছিলেন।

গীতার এই ভাবনাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই ভারতে প্রথম বৃটিশ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮৫ খৃঃ ইংরাজীতে গীতার অনুবাদ করেছিলেন। তারপর আমেরিকার গবেষক এমারসন থেকে সুইস মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল জং (Carl Jung) সহ বহু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ গীতার অনুবাদ করেছেন। পাকিস্তানী গবেষক আকবর আহমেদ জানিয়েছেন মোগল রাজপুত্র দারা শিকো গীতা-র বাণীতে এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রন্থটি পার্শী ভাষায় অনুবাদ করেন।

অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ কপালে ভাঁজ ফেলেছে চীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০১২-র ফেব্রুয়ারি ৫০০০ কিমি. দূরত্বের অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করতে চলেছে ভারত। এমনটাই জানাচ্ছেন ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর জেনারেল ভি কে সারস্বত। আর তা নিয়েই চীনের সরকারি সংবাদমাধ্যমে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে আগামীদিনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তম শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চীনকে লক্ষ্যবস্তু করছে ভারত। প্রতিবেদনে অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রটিকে 'ঘাতক' আখ্যা দিয়ে দাবি করা হয়েছে, এর দৈর্ঘ্য এত বেশি যে এটি চীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরকে আঘাত হানার ক্ষমতা রাখে। গত ১৮ ডিসেম্বর চীনের সরকারি মুখপত্র পিপল ডেইলি-তে 'ভারতের সেনাবাহিনীর আড়ালে বিপদের ঝুঁকি বাড়ছে' শীর্ষক সংবাদে মন্তব্য করা হয়, ''ভারতের আমলা এবং বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন তাদের অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্র কোনও বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে 'ঘাতকে'র কাজ করবে। তাঁদের এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার--- তাঁদের আসল উদ্দেশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্ষমতা বিস্তার করা।'' চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়েছে, 'এই মিসাইল যুগে ঠিক কতগুলো ক্ষেপণাস্ত্র যথেষ্ট, এই বিষয়টা কিন্তু সব সরকারকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।'

এর জবাবে ভারতও পাল্টা বলেছে যে অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ তাদের নিরাপত্তাজনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষারই ফসল এবং ভারত আশা করছে আগামীদিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সুতরাং এবিষয়ে কোনও বিদেশী হস্তক্ষেপ তারা বরদাস্ত করবে না। চীনের সংবাদমাধ্যম গত মাসে ৩০০০ কিমি দৈর্ঘ্যের অগ্নি-৪-এর সফল উৎক্ষেপণের খবর পরিবেশন করেছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন চীনের বেশ কয়েকটি বড় শহর এই ক্ষেপণাস্ত্র সীমার মধ্যে থাকলেও, চীনের দূরবর্তী বেশ কিছু অঞ্চল এর রেঞ্জের বাইরে থাকবে। তাঁরা এও বলছেন কম দৈর্ঘ্যের অগ্নি-১ ও অগ্নি-২ যেমন ছিল মূলতঃ পাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট, তেমনি তুলনামূলকভাবে অধিক দৈর্ঘ্যের অগ্নি-৩, ৪ ও ৫-কে মূলতঃ চীনের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এদিকে চীনের সরকারি সংবাদমাধ্যম ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেও, সবার নজর এড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাল্টা প্রস্তুতি নিচ্ছে। সম্প্রতি এনিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিব্বত ও জিনজিয়াং প্রদেশে লম্বা ও মাঝারি দৈর্ঘ্যের ক্ষেপণাস্ত্র ভারতকে লক্ষ্য করে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে যে চীন গত বছর পুরনো তরল জ্বালানী নিউক্লিয়ার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সি এস এস-৩ আই আর বি এম পরিবর্তে অত্যাধুনিক কঠিন জ্বালানি সি এস এস-৫ এম আর বি এম দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র গঠন করেছে।

FINS-এর সেমিনারে আশঙ্কা

বাংলাদেশ আবার পাকিস্তানের কব্জায় যেন না যায়

বাসুদেব পাল।। ''যে জেহাদি ও পাকিস্তানী থাবা থেকে ২৪ বছর পর মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে তা যেন আবার ওই জেহাদি ও পাকিস্তানীদের খপ্পরে না চলে যায়। এটা বাংলাদেশের সর্বসাধারণ মানুষ ও বাংলাদেশ সরকারকে আজ স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পূর্তিতে ভেবে দেখতে হবে। আর যদি তা হয় তবে বাংলাদেশ এবং ভারত— কারোর পক্ষেই কল্যাণকর হবে না।''

আলোচনা সভার উদ্বোধন করছেন মহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ও ডঃ বি পি সাহা।

গত ১৬ ডিসেম্বর কলকাতায় FINS (ফোরাম ফর ইন্টিগ্রেটেড ন্যাশনাল সিকিউরিটি) আয়োজিত সারাদিনব্যাপী এক আলোচনাসভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন ফোরামের সর্বভারতীয় মার্গদর্শক শ্রী ইন্দ্রেশকুমার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চল্লিশবছর পূর্তি উপলক্ষে ফোরাম (FINS)-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গতিশীলতা' শীর্ষক এক সর্বভারতীয় আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল নেতাজী সুভাষ রোডের উইলিয়াম মাগোর হলে। এদিনকার আলোচনা সভায় ইন্দ্রেশজীই ছিলেন শেষ বক্তা। তিনি সারাদিনের আলোচনা শোনার পর উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, সুসম্পর্কের এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা দু'দেশের ক্ষেত্রে সমান। দেখতে হবে দু'দেশের সমান আবশ্যকতা, সমান শত্রু-মিত্রভাবনা এবং কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে সমান সামঞ্জস্য কোথায় রয়েছে। চীনের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার শিকার ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা সবাই। তিব্বত দখল করার পর চীন এবার হিমালয় সন্নিহিত এলাকাকে ঘিরে ফেলেছে। দুদেশের সামঞ্জস্য বিষয়ে ইন্দ্রেশজী বলেন, বাংলাদেশ ভারত থেকেই উদ্ভুত হয়েছে। একই ভূ-ভাগে ১৯৪৭ এর আগে জন্মগ্রহণকারীরা ভারতীয়, '৪৭ এর পরে পাকিস্তানী এবং '৭১ এর পরে বাংলাদেশী। সত্যের ভিত্তিতে মূলে (Root) যেতে হবে। দুটি দেশের প্রায় সবারই পূর্বপুরুষ হিন্দু।

মাওবাদও দুটি দেশের পক্ষে এক সমান বিপদ। এজন্য ভারত ও বাংলাদেশের উচিত জেহাদি ও মাওবাদীদেরকে সমূলে উৎখাত করা এবং এজন্য কোনওভাবেই দেশের মানুষ এবং মাটিকে ব্যবহার করতে না দেওয়া।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত ইন্দ্রেশ কুমার। বসে শেষাদ্রীচারী, ডঃ শেখতকর ও ভি এস পাটিল।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সে দেশের পক্ষে অন্যতম সঙ্কট এবং তার জন্য তাদেরকে ভারতে ঠেলে না দিয়ে সেদেশেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ইন্দ্রেশজী এদেশের রাজনীতি-বিদদের মনে করিয়ে দিয়েছেন তারা যেন ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে ভোটার করে দেশের বিপদ ডেকে না আনেন। আফসোসের সুরে তিনি বলেন, ভারতের রাজনীতিবিদরা সত্যের আধারে সমস্যার মোকাবিলা না করে তোষামোদ করাতেই সব বিপত্তি দেখা দিয়েছে। চীনের মতো ঘৃণা বা আমেরিকার মতো দমননীতি ঠিক নয়। ইন্দ্রেশজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলাদেশের দেড় কোটি সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ও জনজাতিদের প্রতি বিগত চল্লিশ বছরে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা সমীক্ষা করে দেখার দাবী জানান। তিনি এও বলেন, ভারতে বসবাসকারী কোনও বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার হয়ে থাকে তা বাংলাদেশ বললে FINS ভারত সরকারকে সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে বলবে। বাংলাদেশেও বেশ কিছু দুষ্কৃতকারী রয়েছে যারা ওদেশের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, উৎপীড়ন চালায়। এটা বাংলাদেশকে বিশেষ ভাবে দেখতে হবে।

সভায় FINS-এর সহ-সভাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভি এম পাতিল তাঁর ভাষণে বলেন ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ ৪০৯৫ কিমি. সীমান্ত নিশ্ছিদ্র করা একান্ত আবশ্যক। ৬০০ কিমি. জলসীমাও সুরক্ষিত রাখতে হবে। ভারত থেকে বাংলাদেশে চোরাচালান (গো-মহিষ, চাল, চিনি, কেরোসিন, ফেন্সিডিল) এবং অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করতে হবে।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন FINS-এর সম্পাদক শেষাদ্রিচারী, সাধারণ সম্পাদক এস এন দেশাই, ডঃ বি পি সাহা (রাজ্য সভাপতি), লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) ডঃ বি এন শেখতকর (সর্বভারতীয় সভাপতি- FINS), এস এন দেশাই (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক), ডঃ শক্তিপদ গণচৌধুরী, ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল তায়াল, এম এল মীনা, বিমল প্রামাণিক এবং বাংলাদেশের কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার মহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। শ্রীরহমান এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের অমূল্য অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তবে তিনি নদীর জলে বাংলাদেশের সমান অংশীদারিত্ব দাবী করেন এবং বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের আবেদন জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন।

FINS-এর পক্ষে সভা পরিচালনা করেন গৌতম রাহা এবং ধন্যবাদ জানান রাজ্য সম্পাদক ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বাণী সান্যাল। প্রসঙ্গত, FINS ১৩ ডিসেম্বর জাতীয় নিরাপত্তা দিবস ঘোষণার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে।

বিষমদে ক্ষতিপূরণ : মুসলিম তোষণেই পরোক্ষে সমর্থন নয় কি?

সকালের খবরের কাগজে এখন মৃত্যুর মিছিল। শোকে কাতর পরিবার পরিজনদের হাহাকারের ছবি। সর্বশেষ সংযোজন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উস্তি-সংগ্রামপুরে বিষমদে অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যু। যে কোনও অকাল মৃত্যুই দুঃখজনক। শোকাবহ। কিন্তু একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো বেআইনি চোলাইয়ের ঠেকে আকণ্ঠ মদ্যপান করে বিষক্রিয়ায় মারা গেলে রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে কেন? গ্রামের মানুষ যারা নিয়মিত বেআইনি ঠেক থেকে চুল্লু পান করে তারা ভালভাবেই জানে কড়া নেশার জন্য চোলাই মদে অল্পমাত্রায় কীটনাশক বিষ মেশানো হয়। বাজারে সহজলভ্য এই কীটনাশক বিষের প্রভাবে চোলাই সেবকরা সাত আট ঘণ্টা অবশ অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। শরীরে ব্যথা বেদনার অনুভব থাকে না। এই জন্যই চুল্লু সেবকরা একে গায়ের ব্যথা মরার ওষুধ বলে বর্ণনা করে।

গ্রামবাংলার বেআইনি ভাটিখানার মালিক— ব্যবসায়ী থেকে গ্রাহক— সেবকরা সকলেই জানে চোলাইয়ের সঙ্গে কীটনাশক বিষ মেশানো হয়। এই বিষের মাত্রা বেশি হলে মৃত্যু হবে। যেমন উস্তি-সংগ্রামপুর-মগরাহাট এলাকায় হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যত্র হবে তা আগাম বলে দেওয়াই যায়। কারণ, কীটনাশক বিষের সহন মাত্রা কতটা হবে তার কোনও ফরমূলা নেই। স্রেফ ভাটিখানার চালকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই একমাত্র মাপকাঠি। অর্থাৎ চুল্লু সেবকরা জেনেশুনেই বিষ পান করতে চুল্লুর ঠেকে যায়। এখন রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিষ মদ পান করাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানালো। এরপর হয়তো ডাকাতি করতে গিয়ে কেউ নিহত হলেও রাজ্য সরকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে। যুক্তি হবে, গরিব বাড়ির ছেলে অভাবে পড়ে ডাকাত দলে যোগ দিয়েছিল। যেমন, মগরাহাটের গ্রামে গ্রামে হুকিং করে বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করাটাই স্বাভাবিক সামাজিক রীতি। বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে যে খরচ দিতে হয় তা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামের মানুষের অজানা। বিশেষ করে যে সব গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষই মুসলিম সম্প্রদায়ের। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের ভাগ পেতে বামফ্রন্ট সরকার হুকিংয়ে কোনওদিনই বাধা দেয়নি। মমতার মা-মাটি-মানুষের সরকারও বাধা দেবে না। বিদ্যুৎ চুরির ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা চাপে শহরের মানুষের ঘাড়ে। অর্থাৎ, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উপর। এইভাবেই দশকের পর দশক জুড়ে মুসলিম তোষণ পশ্চিমবঙ্গে চলছে। চোলাই মদ পান করে ডায়মন্ডহারবার এলাকার গ্রামের মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তারা সকলেই ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের।

গূঢ়পুরুষের

কলম

তাই তড়িঘড়ি আর্থিক ক্ষতিপূরণের ঘোষণা মা-মাটি-মানুষের সরকারের নেত্রীর। ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ। একমাত্র আল্লার 'বেহেস্তে' ঢালাও সুরাপানের অনুমতি আছে। নশ্বর পৃথিবীতে মদ্যপানকে ইসলামে 'গুণাহ' বা ধর্মবিরোধী বলা হয়েছে। জেনেশুনে ইসলাম বিরোধী চোলাই মদ পান করে যারা মারা গেল তারা নিশ্চিতভাবেই আল্লার সাচ্চা বান্দা নয়। কিন্তু রাজ্যের মৌলবি-মৌলানারা সেই সত্য কথাটা বলছেন না। কেন?

ভারতে বিষমদে মৃত্যু নতুন কোনও ঘটনা নয়। দেশের সব রাজ্যেই ঘটেছে। একমাত্র গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর সরকার বিষমদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। ভারতে গুজরাটই একমাত্র রাজ্য যেখানে মদ কেনাবেচা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এমন 'টোটাল প্রহিবিসন" সারা দেশে দ্বিতীয় কোনও রাজ্যে নেই। আজ থেকে দুই বছর আগে ২০০৯ সালে গুজরাটে বেআইনি চোলাই পান করে ১৩৩ জন মারা যায়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্রুততার সঙ্গে বিধানসভায় আইন পাশ করে সমগ্র গুজরাটে দেশি-বিদেশি মদ প্রস্তুত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেন। এখানেই শেষ নয়। রাজ্যের আগবগারি আইন সংশোধন করে বিষমদ প্রস্তুতকারকদের 'মৃত্যুদণ্ডের' বিধান রাখা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভা সকলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গুজরাটের রাজ্যপাল কমলা বেনিওয়াল রাজ্য বিধানসভায় অনুমোদিত এই বিলটিতে সই করতে আপত্তি জানান। রাজ্যপাল সাহেবা 'মৃত্যুদণ্ড' কথাটি খারিজ করতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজি হন না। বিলটি টানা দু'বছর রাজ্যপালের টেবিলে ফাইলচাপা হয়ে পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিলটিতে বিষমদের প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান থাকা উচিত কিনা জানতে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের মতামত জানতে চাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সম্মতি জানাতে রাজ্যপাল সাহেবার সামনে বিলটিতে স্বাক্ষর করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। গত ৫ ডিসেম্বর বিলটিতে রাজ্যপাল সম্মতি দিয়েছেন। ফলে, ভারতে গুজরাটই একমাত্র রাজ্য যেখানে বেআইনিভাবে প্রস্তুত মদের প্রভাবে প্রাণহানি হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে সরবরাহকারীকে। ক্ষতিপূরণের সস্তা রাজনীতির থেকে এটাই ভাল নয় কি?

‘আমরি’ কর্তাদের সঙ্গে সিপিএমের লেনদেন ছিল বরাবরই

নিশাকর সোম

এরাজ্যে নানা ঘটনায় বহু লোকের প্রাণহানি ঘটছে। এ সমস্তকে ছাপিয়ে উঠে এসেছে আমরি নার্সিংহোমে আগুন এবং ধোঁয়ার গ্যাসে প্রায় একশ’ মানুষের প্রাণহানি। খবরে প্রকাশ, আমরি কর্তৃপক্ষ এই আগুন লাগার সংবাদ চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্তৃপক্ষ ফোন পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু উদ্যোগ নেননি কেন? শোনা যাচ্ছে, রোগীদের বের করে আনার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী ছিল না। খবরে আরও প্রকাশ, এই নার্সিংহোমে গত অক্টোবর মাসে আগুন লেগেছিল। এই আগুন লাগার খবর দমকলকে দেওয়ার জন্য এক কর্মীকে ‘সাসপেন্ড’ করা হয়। কর্মীদের ধূমপান-এর জন্য নাকি ফায়ার অ্যালার্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এসি ডাক্টের মুখে যে ভালব থাকে সেগুলিকে অকেজো করে রেখে দেওয়ার ফলে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা সৃষ্টি হয়ে বহু মুমূর্ষুরোগী শ্বাসরোধে নিহত হলেন। নার্সিংহোমের রাত্রি প্রশাসক ফাজিদ হোসেন এবং নিরাপত্তা আধিকারিক পি কে ঘাটা সাফাই গেয়েছেন এ সি ডাক্টগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা, এতে ধোঁয়া দ্রুত ছড়াতে পারতো না। এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই নার্সিংহোমের প্রথম কর্তা হলেন শ্রবণ কুমার টোডি— তাঁকে সিপিএম সরকার দু’ হাজার কোটি টাকার একটি আবাসন প্রকল্প পাইয়ে দিয়েছিল! এই ঘটনা বুদ্ধদেববাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে হয়েছিল। যে জমিতে নার্সিংহোম সেই জমিটি দিতে তদানীন্তন ভূমিরাজস্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী চাষের জমি বলে আটকে দিয়েছিলেন। নিরাময় পলিক্লিনিকটিকে জ্যোতিবাবুরা টোডিদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন— কিন্তু ‘বিপ্লবী’ মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা মঞ্জুর করেছিলেন। উল্লেখ করা দরকার, শ্রবণ কুমার টোডি ঢাকার বারদীতে থাকতেন জ্যোতি বসুর বাড়ির নিকটে। জ্যোতি বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর দীর্ঘদিনের। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিদেশে গেলে শ্রবণ টোডিও যেতেন কেন? কারণ জ্যোতি বসুর কথা শ্রবণ কুমার টোডি বিশ্বস্তভাবে পালন করে থাকতেন। একটি দৈনিক-এর জন্মলগ্নে টোডিকে জ্যোতি বসু শেয়ার কিনতে বলেন। টোডি সেই পত্রিকায় লগ্নি করে একটি পাবলিকেশন করেন। শোনা যায় সেই পাবলিকেশনটির নাম শ্রবণ কুমার টোডির মাতৃদেবীর নামে হয়। সেই পাবলিকেশনটি তৃণমূলের ‘প্রভাতী দৈনিকে’ অধুনা বিরাজমান! তবে এই পত্রিকার সংস্রব থেকে এস কে টোডি এবং জ্যোতি-ভাগ্নে অমল দত্ত সরে যেতে বাধ্য হন। আজ সেই পত্রিকাই টোডিদের তীব্র সমালোচনা করছে! বাজারি রটনা হলো আমরির সঙ্গে নাকি এই পত্রিকার মালিক-শিল্পপতিরও সম্পর্ক আছে? যে জমিতে সিপিএমের দৈনিক পত্রিকার অফিস, সেই জমিতে টোডিদের এক সংস্থার অফিস আছে। সিপিএমের দৈনিক পত্রিকার বাড়িটা এস কে টোডি বিনামূল্যে করে দিয়েছেন বলেও অনেক কথা উঠেছে। এস কে টোডি জ্যোতিবাবুর অবাধ সাহায্য পেয়েছিলেন। কেন? জ্যোতিবাবুর ব্যক্তিগত বা পরিবারগত কোনও স্বার্থ কি এতে ছিল?

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জমিতে সিপিএমের দৈনিক এবং টোডিদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অধিষ্ঠিত সেই জমিটির মালিক ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া আচার্য নাকি মাত্র এক টাকায় এই বিশাল সম্পত্তি বিক্রি করে দেন?

শ্রবণ টোডি

জ্যোতি বসু

ইস্টার্ন বাইপাসের লাগোয়া ৬৯ একর জমি এন আর আই কমপ্লেক্স বানানোর নামে টোডিরা পেয়েছেন। ২০০৯ সালে দুই কিস্তিতে রাজ্য সরকার এই জমি দেয়। প্রথম দফায় ২০ একর জমি দেওয়া হয়। এই সরকারি সুবিধা দেবার জন্য সিপিএম সরকার কৌশল করে প্রথম দফায় ৫১ শতাংশ জমির ভাগ নেয়। তারপর সেটা নেমে আসে ২৬ শতাংশে। বর্তমানে ১১ শতাংশের মালিক রাজ্য সরকার। এই জমিতে ফ্ল্যাট-বাংলো কেনা-বেচা করেও টোডিরা সরকারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ফাঁকি দেবার সুযোগ করে নিয়েছিলেন বলে খবর। ডিডভ্যালুতে আট হাজার সাড়ে আট হাজার প্রতি বর্গফুটের জমি বেচে সরকারি কোষাগারে জমা পড়া অর্থের পরিমাণ ছিল প্রতি বর্গফুট হাজার টাকা হিসেবে। এই জমি দেওয়া বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন বিনয় চৌধুরী। তিনি এ নিয়ে জ্যোতি বসুকে কড়া নোট পাঠান। কিন্তু জ্যোতিবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কে আটকায়? বিনয়বাবু ছাড়া সিপিএমের রাজ্য-মাতব্বরগণ যে টোডির পক্ষে। শুধু জ্যোতিবাবুর আমলে নয়, বুদ্ধবাবুর আমলেও টোডিরা বহু সুবিধা পেয়েছেন। পরাজিত আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব ওঁদের সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থায় বহু আবাসন করেছিলেন। তাইতো গৌতমবাবু সম্পর্কে ‘প্রমোটারিং মন্ত্রী’ বলে একটা কথাও চালু ছিল। বিনয় চৌধুরী সখেদে বলেছিলেন, ‘অ্যা গভর্ণমেন্ট ফর দ্য প্রমোটার অফ দ্য প্রমোটার বাই দ্য প্রমোটার।’ একথা বলার পর জ্যোতি বসুর উক্তি ছিল— ‘বিনয়বাবু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেই পারেন!’ শুধু সিপিএম নয়, তৃণমূল শাসিত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রুবি’র কাছে আমরি-র দুই অংশীদার ইমামি এবং শ্রাচী-গোষ্ঠীর (টোডিদের) বিলাসবহুল অফিসের বেআইনি নির্মাণ-কে ছাড়পত্র দিয়েছে!

রাজখোয়ার গলায় পরেশের প্রতিধ্বনি

''যদি সরকারের সঙ্গে উলফা (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম) জঙ্গিগোষ্ঠীর শান্তিবার্তা সফল না হয়, তাহলে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিরা পুনরায় হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারে। অসমের মানুষের মতামতও নিতে চাইবে। এবং সেক্ষেত্রে অসমের পরিস্থিতি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের মতো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। যার কোনও শেষ নেই।'' সম্প্রতি উলফা- চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকাকে একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত নভেম্বরে এক জনসভায় বক্তব্য রাখার জন্য তিনি শিলচরে এসেছিলেন। অসমের ডিমাসা জনজাতিদের আলোচনাপন্থী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ডিমা হালাম দাওগা (নুনিসা)-র ডাকে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে তাঁর শিলচর আসা বলে তিনি জানান। ডিমাসা জনজাতি উত্তর কাছাড় জেলা এবং সন্নিহিত কাছাড়, কারবি আংলং প্রভৃতি জেলার ডিমাসা বসতিপূর্ণ জেলা নিয়ে স্বশাসিত (স্বাধীন?) প্রদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডি এইচ ডি-র দুটি গোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দিলীপ নুনিসা গোষ্ঠী সরকারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার পর দুই জেলার সীমাবর্তী প্রত্যন্ত কুমাছড়াতে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠনের জন্য জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই দুই সন্ত্রাসী নেতার ঘনিষ্ঠতা শান্তিকামী সাধারণ মানুষের পক্ষে উদ্বেগজনক বৈকি!

হাইকোর্টকে বুড়ো আঙুল আলিগড়ের

হিন্দুদের আবাদী জমিতে মুর্শিদাবাদের সুতিতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে। এই খবর স্বস্তিকার শেষের পাতায় গত নভেম্বর মাসে বের হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসের প্রথম তারিখ স্থানীয় মানুষরা লক্ষ্য করে যে আবাদী জমিতে ইঁট বালি ও পাথর পড়তে শুরু করেছে। দলবদ্ধভাবে গ্রামাবাসীরা তাদের বাধা দেয়। গ্রামবাসীরা সরকারি কাগজপত্র দেখতে চায়। তখন তারা ওগুলি কয়েকটি মুসলমান বিড়ি কোম্পানীর মালিক ও কনট্রাক্টারের পাঠানো বলে জানায়। পুলিশও গ্রামবাসীদের সাহায্য করে। ইতিমধ্যে কয়েক শো গাড়ি ইঁট, পাথর ও বালি পড়ে জমির ফসলের ক্ষতি হয়। গ্রামবাসীদের বাধাদানের পর থেকে আর কোনও উপকরণ অবশ্য সেখানে পৌঁছায়নি। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বিরোধী মঞ্চ মহকুমা শাসকের নিকট ফসলের ক্ষতিপূরণ এবং অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। প্রসঙ্গত এই মুসলিম

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস তৈরির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের রায় রয়েছে এবং এখানে কোনও নির্মাণ কাজ হবে না বলেও জানানো হয়েছে। তবুও স্থানীয় মুসলিম এম এল এ, বিড়ি কোম্পানীর মালিক ও কন্ট্রাক্টার যোগসাজস করে নিজেদের প্রচেষ্টায় নির্মাণ কাজ শুরু করতে চেষ্টা করেছিল। স্থানীয় ক্যাম্পাস-বিরোধী মঞ্চের সম্পাদক নারায়ণ দাস জানিয়েছেন যে মহকুমা শাসকও এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস তৈরির কোনও কাগজ দেখাতে পারেননি। যার ফলে পুলিশ প্রশাসনের কোনও সাহায্য না পেয়ে তারা পিছু হটেছে।

অসমে বাঙালী হিন্দুদের নাগরিকত্ব

ভারতীয় জনতা পার্টির অসম শাখা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের কাছে এবার অসমে বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালী হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য জোরদার দাবী জানালো। গত ১০ ডিসেম্বর তিন বিজেপি নেতা-নেত্রী —কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, রমেন ডেকা এবং বিজয়া চক্রবর্তী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই মর্মে এক স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা জানিয়েছেন, যে সকল বাস্তুচ্যুত বাঙালী হিন্দু অসমকেই তাদের ঘর বলে বসতি স্থাপন করেছেন তাদেরকে ডি-ভোটার (ডাউটফুল বা সন্দেহজনক) বলে হয়রান করা হচ্ছে। এজন্য ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৬৪ এবং নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ সংশোধন করার দাবী জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য অসমে আগত উদ্বাস্তু বাঙালী হিন্দুদের নাগরিকত্বের দাবীটি একটি সর্বভারতীয় বিষয়। তাদেরকে প্রাথমিকতার ভিত্তিতে পুনর্বাসন দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ থেকে আগত বাস্তুচ্যুত বাঙালী হিন্দুদের ক্ষেত্রে 'ডি' ভোটার-এর কোনও ব্যাপারই নেই। একথা তারা স্মারকলিপিতে জানিয়েছেন। অসমে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে 'ডি' ভোটার বলে চিহ্নিত করে ভোটদান থেকে বিরত রাখা হয়।

'নির্বাচনে'র আওয়াজ রাশিয়ায়

রাশিয়ার রাজপথগুলি বেশ কিছুদিন ধরেই নাগরিকদের প্রবল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সাক্ষী হচ্ছে। হাজার হাজার দেশবাসী 'আবার নির্বাচন, আবার নির্বাচন' বলে আওয়াজ তুলেছেন। এমনটাই প্রিন্ট ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের সংবাদে প্রকাশ। সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বিপুল সংখ্যক বিক্ষুব্ধ জনতার অনেকের মুখই টিভির ক্লোজআপে দেখানো হচ্ছে। এটি অভূতপূর্ব যে রাশিয়ায় গত দশ বছর ধরেই মূলত শাসক দলের অধীন এন টি ভি-তে কেবলমাত্র সরকার অনুমোদিত খবরই ছাড় পত্র পেত। দেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজয়ী 'ইউনাইটেড রাশিয়া' দল ও তার সর্বোচ্চ নেতা প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিনের নির্বাচনকে তারা অসিদ্ধ ও কারচুপির মাধ্যমে সংঘটিত বলেই অভিমত জানাচ্ছে। জনতার মূল দাবি নির্বাচন বাতিল করা। এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সরকারি আবেষ্টনীর মধ্যে গত এক সপ্তাহের ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের গভীরতা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চিতভাবেই সত্যের দিকে ঘুরিয়েছে, এমনটাই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। লৌহ যবনিকা কি ক্রম ক্ষীয়মান? ক্ষমতায় টিকে থাকতে এমন তাত্ত্বিক বুলি না কপচে লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেনের কথা মাথায় রেখে জনতার রোষ আঁচ করাই হয়তো বিধেয়।

রাশিয়ান যুগলের হিন্দু প্রথায় বিবাহ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উচ্চপ্রশংসা সত্ত্বেও ('ম্যান অফ পিস') পাকিস্তানের সিন্ধ্ প্রদেশে সাম্প্রতিককালে চলেছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিধন, উৎপীড়ন ও অত্যাচার এবং হিন্দু রমণীদের ধর্ষণ- শারীরিক নির্যাতন।

এই হিন্দু-নিধন-পীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এক রাশিয়ান নাগরিকের ভারত-প্রেমের কথা। ৩৯ বছরের অ্যালেক্সি জেলেনিন সুদূর মস্কো থেকে ভারতের দক্ষিণা কান্নাডার ইন্দাবেত্তু গ্রামের শ্রীঅর্ধনারীশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন ৩১ বছরের কনে পোলিনা কোর্নিয়েন্‌কো'র সঙ্গে হিন্দু ধর্মমতানুযায়ী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে। ধনুলগ্নে শাড়ি পরিহিতা, কেশগুচ্ছে যূথীপুষ্পের সুগন্ধি বিন্যাসে সজ্জিতা পোলিনার কণ্ঠে অ্যালেক্সি মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেন, করেন সপ্তপদী পরিক্রমা ২০১১ সালের ২০ নভেম্বর।

সাংবাদিকদের অ্যালেক্সি জানান, তিনি গণেশ দেবতার যথার্থ পূজারী, তাই হিন্দু প্রথায় পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তিনি মস্কোতেও গণেশ-উপাসনা করেন। অ্যালেক্সি চিত্র-নির্মাতা এবং অ্যানিমেশন স্টুডিয়োর মালিক।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর এখন সরে যাওয়াই উচিত

তারক সাহা

এফ. ডি. আই. নিয়ে কংগ্রেস পালাবার পথ খুঁজছিল। সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা হয়েছে কংগ্রেসের। শীতকালীন অধিবেশনের ঠিক আগেই এফ. ডি. আই. নিয়ে সংসদকে এড়িয়ে সরকার খুচরো ব্যবসায় একতরফাভাবে ৫১ শতাংশ লগ্নী বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলে। সরকার এটাকে মন্ত্রিসভায় পাশ করালেও বিষয়টা একেবারেই প্রধানমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত। এখন যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে তো কংগ্রেসের কাছে ডঃ সিং বোঝার মতো।

অথচ উপায়ও নেই কংগ্রেসের কাছে। রাহুল এখনও কাঁচা। দেশ চালাবার মতো বুদ্ধি এখনও পক্কতা পায়নি। ২০১৪ সালেও পরিপক্কতা আসবে কিনা তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই সংশয়ে। রাহুলের কাছে এখন 'অ্যাসিড টেস্ট' উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন। কংগ্রেস যদি সেখানে একক গরিষ্ঠতা পায় তাহলে তো কথাই নেই, নিদেনপক্ষে যদি মিলিজুলি সরকার গড়ার অবস্থাতেও পৌঁছায় তবেও তো রাহুলজীর কেল্লাফতে। ২০১৪ সালে কংগ্রেস রাহুলকে সামনে রেখে তথাকথিত নাম্বার ওয়ান ইকনমিস্ট মনমোহনকে দরজা দেখাবে! সুতরাং সব ঠিকঠাক চললে রাহুলজী উত্তরপ্রদেশে একটা মোটামুটি ক্যারিশমা দেখালেই মনমোহনের বিদায় আসন্ন।

তাই বলছিলাম প্রধানমন্ত্রীর মানে মানে সরে পড়াই উচিত। তাহলে তাঁকে আর দেশবাসীর সামনে অপদস্থ হতে হবে না। খুচরো ব্যবসা নিয়ে মনমোহনের পাশে রয়েছেন বড় জোর বিশ-তিরিশজন সাংসদ। দেশের অধিকাংশ রাজ্য এব্যাপারে নারাজ। ন' দিন ধরে সংসদ অচল ছিল। শরিকরাও দ্বিচারিতায় ভুগছে। ডি এম কে-র খুচরো ব্যবসায় আপত্তি আর ভোটাভুটি হলে তা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি। রাজ্যপাট হারিয়ে ডি এম কে তার অবস্থান পাল্টেছে। ক্ষমতায় থাকার সময়ে কংগ্রেস ছিল ডি এম কে-র পুচ্ছ। আর এখন ডি এম কে কংগ্রেসের পুচ্ছ। আবার কানিমোঝি জামিন পেয়ে বাইরে, সুতরাং করুণানিধির এক স্বাভাবিক দায়বদ্ধতা রয়েছে মনমোহনের পাশে দাঁড়ানোর। আর ডি এম কে সেটাই করেছে। এ রাজ্যে অবশ্য চালচিত্রটা অন্যরকম। সদ্য ক্ষমতায় এসে মমতার অবস্থান এখন তুঙ্গে। এর মধ্যে আবার দক্ষিণ কলকাতার উপ-নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী সুব্রত বক্সী আড়াই লক্ষ ভোটের ব্যাপক ব্যবধানে জয়ী। সুতরাং অন্ততঃ

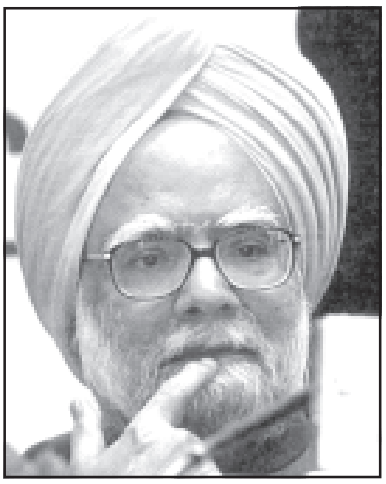

পাঁচ বছর মমতার প্রয়োজন নেই কংগ্রেসকে। তাই প্রণব-মনমোহনের সব অনুরোধ উপরোধ ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন মমতা।

মমতার খোলা দরজা দিয়ে এখন সবেগে দৌড়ে পাল্লাছে কংগ্রেস। আপাতত খুচরো ব্যবসা শিকেয়। ডি এম কে-টি এম সি ভোটদানে বিরত থাকলেও সরল পাটিগণিতে কংগ্রেসের সংখ্যা কম। এই অবস্থায় ভোটভুটি হলে মুখ পুড়বে কংগ্রেস তথা সরকারের। ভোটাভুটিতে সরকার হারলে সরকার পড়বেই এমন বাধ্য-বাধকতা না থাকলেও একটা নৈতিক দায় এসে পড়ে এবং তাতে সরকার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

সবদিক বিচার করেই কংগ্রেস তথা সরকারের ক্রাইসিস ম্যানেজার একটা রুটিন প্রক্রিয়া অবলম্বন করলেন। ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গিয়েছিল যে, খুচরো ব্যবসা নিয়ে সরকার আর এগোবে না। সংসদে ছুটির অবকাশে ক্রাইসিস ম্যানেজার প্রণববাবু ব-কলমে মমতাকে দিয়ে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তে একটা সীলমোহর লাগালেন।

ইতিমধ্যে সরকার বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্য, উত্তরপ্রদেশে আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী লগ্নী-র সিদ্ধান্ত আপাতত হিমঘরে পাঠিয়েছে। যার ফলে সংসদ চালু হয়েছিল। আর সংসদে জিনিসপত্রের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। ২০০৮ সালে যখন বিশ্বজুড়ে মন্দার প্রকোপ জারি তখনও দেশের অর্থব্যবস্থা এমন জটিল পর্যায়ে পৌঁছায়নি। আর্থিক উন্নতির হার ছিল বার্ষিক নয় শতাংশ, ডলার পিছু টাকার দাম ছিল ৪৪-৪৫ টাকার মধ্যে। মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫ শতাংশের মতো। তখন অবশ্য শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল। অথচ ২০০৯ সালে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার পরেই দেশের অর্থনীতি যেন সংকটের আবর্তে জড়িয়ে পড়ল খুব তাড়াতাড়ি।

২০০৯ সালে নির্বাচনের ঠিক আগে ইউ পি এ-১ সরকারের আমলে ৯ টাকা পেট্রোলের দাম কম ছিল। ২০০৯ সালের মে মাসে নির্বাচনের সময়ে দিল্লিতে পেট্রোল মিলত লিটার পিছু ৪৩ টাকা দরে আর ২০১১-র ১৫ সেপ্টেম্বর সেই দাম বেড়ে হয়েছে লিটার পিছু ৬৭ টাকা। অর্থাৎ মাত্র দু' বছরে দিল্লিতেই তেলের দাম বেড়েছে ২৪ টাকা। শতাংশের হিসেবে ৫০ শতাংশের বেশী। সরকার বলছে দেশের তিনটি সরকারি তেল সংস্থায় সরকারের আর নিয়ন্ত্রণ নেই। ২০১০ সালের জুনের পর থেকেই শিথিল হয়ে গেছে সেই নিয়ন্ত্রণ। আন্তর্জাতিক বাজারদরের ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের তেলের দামের ওঠা পড়া হবেই। অথচ মুখে বললেও সরকার তেলের ব্যবসায় তেল কেনা-বেচায় অংশ নিতে বিদেশী সংস্থাকে ছেড়ে দেয়নি। সরকার একদিকে খুচরো ব্যবসায় বিদেশীদের ডেকে এনে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কড়া প্রতিযোগিতার সামিল করতে চাইছে, অন্যদিকে আবার তেল সংস্থাগুলিকে প্রতিযোগিতায় নামতে দিচ্ছে না। এখানেই সরকারি উদ্দেশ্য স্পষ্ট হচ্ছে।

এন ডি এ আমলে দেশের যে আর্থিক বৃদ্ধি

হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল কম সুদের হার। মানুষ কম সুদের হারের জন্য গাড়ী-বাড়ী, অন্য ভোগ্যপণ্যতে লগ্নী করছিল। বাড়ছিল চাহিদা আর চাহিদা বাড়তেই হচ্ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদন বৃদ্ধি হলেই জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নাকি বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ। ১৯৯১ সালে 'নিয়ন্ত্রিত আর্থিক সংস্কারের' ফলে দেশের অর্থনীতিকে, একেবারে খাদের কিনার থেকে উদ্ধার করেছিলেন মনমোহন। কুড়িয়েছিলেন মানুষের সমর্থন। অথচ দুই দশক বাদে সেই মানুষটি আজ সবচেয়ে বেশি ধিক্কৃত। এর কারণ তাঁর আপোসনীতি, দুর্বলনীতি নির্ধারণ, ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি বহুবিধ অক্ষমতা।

এন ডি এ সরকারের ২০০৪ সালে যে পতন ঘটেছিল তার অন্যতম কারণ ছিল সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়ার নীতি। বাজারদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদের হার বাড়িয়ে দিয়ে সরকারের মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন জোগানো। অবশ্য সুদখোর মধ্যবিত্ত মানুষের উপকারই হয়েছিল বটে!

সরকার বলে বেড়াচ্ছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ার জন্য তিনটি সরকারি তেল সংস্থাই লোকসানে চলছে। অথচ পরিসংখ্যান বলছে সরকারি এই তথ্য সর্বৈব মিথ্যা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার তেলের দাম বাড়িয়েছে। এন ডি এ-ও তার ব্যতিক্রম নয়। পূর্বের সরকারগুলি যখন তেলের দাম বাড়াত তখন তারা এতটা অমানবিক ব্যবস্থা নেয়নি যা এখন মনমোহন সরকার নিচ্ছে। আমরা সবাই জানি, বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে বা অন্য কোনও কারণে তেল উৎপাদক দেশগুলি তাদের অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়িয়েছে, আবার অনেক সময়ে কমিয়েওছে। গত এক বছর অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ৬৪ ডলার থেকে বাড়তে বাড়তে ৯০ ডলারে উঠেছে। গত দু' বছরে তেলের দাম গড়-পড়তা ৩৪.৫৭ ডলারে সীমাবদ্ধ ছিল। আর ওই সময়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে থেকেও লোকসান হয়নি তেল কোম্পানীগুলির। গত দু' বছরের হিসেব দেখলে বোঝা যায় যে এই তেল সংস্থাগুলি কোনওটাই লোকসানের মুখ দেখেনি, উল্টে বেশ ভালই লাভ করেছে। আর তা হয়েছে ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ বৎসর-গুলিতে ওই সংস্থাগুলির লাভের পরিমাণের জন্য (সারণী দ্রষ্টব্য)।

কোম্পানী	আর্থিক বছর	লাভের অংশ (কোটি টাকার)
ও এন জি সি	২০০৮-০৯	১৬০৪১
গেইল	”	২৮১৪
ইন্ডিয়ান অয়েল	”	২৫৭০
অয়েল ইন্ডিয়া	”	২১৬৬
ও এন জি সি	২০০৯-১০	১৬৭৪৫
গেইল	”	৩১৩৯
ইন্ডিয়ান অয়েল	”	১০৩২১
অয়েল ইন্ডিয়া	”	২৬১১

এছাড়া ২১৭টি সরকারি সংস্থা থেকে সরকারের আয় হয়েছে ৯২৫৯৩ কোটি টাকা ওই দুই আর্থিক বছরে। এর মধ্যে তেল কোম্পানীগুলির মোট লাভ ৩২৮৫৭ কোটি টাকা। এই আয় মোট আয়ের ৩৬ শতাংশ। সুতরাং তৈল সেক্টরে লোকসান হচ্ছে বলে যতই হৈ চৈ করুক সরকার, সরকারি পরিসংখ্যানই কিন্তু বলে দিচ্ছে সরকারের ব্যাখ্যা সর্বৈব মিথ্যা। আর এইভাবে পেট্রোল-ডিজেল-কেরোসিন-এল পিজি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি মানুষের ওপর বোঝা বাড়াচ্ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে উচ্চ সুদের হারের কারণে। মার খাচ্ছে উৎপাদন শিল্প, দেশের গড় বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়িয়েছে ৬ শতাংশে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভ্রান্ত অর্থনীতিই আম আদমির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধি, আর্থিক বৃদ্ধিহার ঊর্ধ্বমুখী, দুর্বল সরকারি সিদ্ধান্ত— এককথায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ সরকার। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক— দুই দিকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখন তাই সরকারের কাণ্ডারী মনমোহনের সরে দাঁড়ানো উচিত।

চীনের বিরুদ্ধে দাবার ঘুঁটি সাজাতে হবে

অতিথি কলম

অশোক কুমার মেহতা

মনে পড়ে আজ থেকে দশ বছর আগে সৈন্যবাহিনীর এক আধিকারিকের স্ত্রী হিসেবে আমার মা প্রায়ই বলতেন— ''দ্যাখ, পাকিস্তানের কথা উঠলেই ভারত কেমন তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে, কিন্তু চীনের বেলায় যেন ইঁদুর হয়ে যায়।'' গত নভেম্বরে 'বালিতে' অনুষ্ঠিত পূর্ব এশিয়া শিখর বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফরকারী কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নাকি চীনের ব্যাপারে যথেষ্ট কড়া অবস্থান নিয়েছেন। তাঁদের কথা অনুযায়ী আমাদের প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রীকে দক্ষিণ চীন সাগরে ভারতের উপস্থিতি নিয়ে চীনের বাধাদানের চেষ্টাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন সেখানে ভারত যে কাজ করছে তা একান্তই বাণিজ্যভিত্তিক। একই কঠিনসুরে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও পাল্টা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, দক্ষিণ চীন সাগরে অন্য কোনও বিদেশী শক্তির কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়া তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। গত ২১ নভেম্বর ২০১১-তেও এই সতর্কবাণী আবার উচ্চারিত হয়েছে। এখন দেখার ভারত এতে পিছিয়ে আসে কিনা?

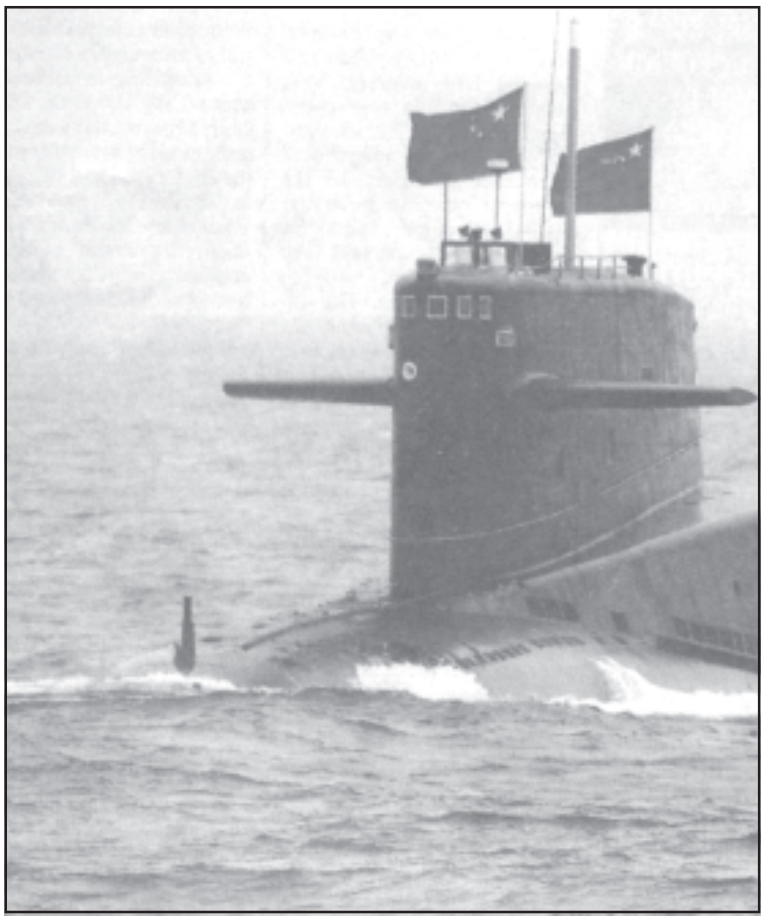

শ্রী মনমোহন সিং বারবার বলে থাকেন চীন ও ভারত উভয়েরই এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। চীন কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রেই এই সহযোগিতার কথা স্বীকার করে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নিজের ঘোষণা অনুযায়ী ২০১১ সালে এয়ার ইন্ডিয়া'র অহরহ সফরকারীদের তালিকার সর্বাগ্রে তাঁর নাম থাকবে, কারণ ওই বছর চীনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি নিজে ন্যূনপক্ষে ২৮ বার তিনি মিলিত হয়েছেন। যে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এটি সর্বকালীন রেকর্ড।

কিন্তু চীনের অনুকূলে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া এগুলির ফলশ্রুতি উল্লসিত হবার মতো নয়। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে চীনের লঙ্ঘন প্রক্রিয়া ও আধিপত্যবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত। তাদের সামরিক তৎপরতা ও সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়া আমাদের চিরাচরিত 'Deterrence' (ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করা)-এর নীতিকে পাত্তাই দেয়নি। ইতিমধ্যেই লাদাখ অঞ্চলে ২০০০ কিলোমিটার সীমান্ত নিজের দিকে দেখিয়ে কাশ্মীরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সীমান্ত বিবাদটিকে চীন অবলীলায় ত্রিপাক্ষিকে পর্যবসিত করেছে। সমাধানহীন ভারত-চীনের প্রাচীন সীমান্ত বিবাদ আজ 'মাদাম তুঁশোর' যাদুঘরে যাবার প্রতীক্ষায়! অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সংখ্যা শ্রী সিং-এর সঙ্গে চীনের কর্তাব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারকেও ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে গেছে। ১৯৮১-'৮৭'র মধ্যে ৮ বার, ১৯৮৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ১৪ বার, ২০০২-০৩ অবধি ১৩ বার উভয়পক্ষই লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (এল এ সি) নিয়ে ভাসাভাসা আলোচনার সঙ্গে সেই সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিক নিয়ে মামুলি আলোচনাই চালিয়ে গেছেন।

সীমান্ত সমস্যা সমাধানের সুযোগ ভারত ১৯৬০ সালেই হাতছাড়া করে। ঘনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত সীমান্ত এলাকার দ্বিপাক্ষিক মানচিত্র আদান-প্রদানের সময় চীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলে (এল এ সি) অবস্থানের আশঙ্কায় আলোচনা থেকে কৌশলে পিছিয়ে যায়। চলতি ত্রি-স্তর আলোচনা (১) রাজনৈতিক ভিত্তিতে মতৈক্য এবং (২) সঠিক সীমান্ত চিহ্নিত করা নকশা তৈরীর পদ্ধতি ও বাস্তব অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই আটকে রয়েছে। কেননা চীন মূল চুক্তি থেকে সরে এসে তাদের মনোমতো নির্ধারিত অঞ্চলেই স্থিতু থাকতে চায়। এর পর থেকে কেবলমাত্র দু'দেশের দু'জন বিশেষ প্রতিনিধিই

জানেন আদতে কি ঘটছে! ইতিমধ্যে চীন সীমান্ত- সমস্যাটিকে অত্যন্ত সুকৌশলে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত বিষয়গুলির দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

সুস্থিতি বজায় রাখতে দু'দেশীয় আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া চূড়ান্ত হলেও, বর্তমানে পূর্বে চিহ্নিত নয় এমন লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (এল এ সি) পর্যন্ত চীন এই ফাঁকে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সৈন্য আমদানী করে গিলগিট বালটিস্তান অঞ্চলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি নিউ দিল্লীর ইউনাইটেড সার্ভিস ইনস্টিটিউশনে এক আলোচনাচক্রে চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের মধ্যপন্থী ও যুক্তিনিষ্ঠ অধ্যাপক ঝউ গেনচেঙ সীমান্ত সমস্যার আশু সমাধানের যুক্তি ও প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখতে কিছুটা সময় একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় ঝউ বর্তমানে যে 'যে অবস্থায় আছে' বা Status quo মেনে চলার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ঝউ সবিস্তারে বলেন দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা সীমান্ত সমস্যা একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হওয়ায় তার সমাধান বিশাল ধৈর্য ও সময়ের অপেক্ষা রাখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালের Treatise of Peace and Tranquility ও '৯৬ সালের Confidence Building Measures কেবলমাত্র status quo মেনে চলার পথই বাতলেছে। আশাবাদীদের কাছে এখন এটুকুই যথেষ্ট বলে মানতে হবে। আমাদের মনে রাখা একান্তই দরকার যে ভারতের সবরকম ক্ষতি করে চীন সীমান্ত সমস্যাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মনোমতো সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে পারবে ততদিন তা ঝুলেই থাকবে। অবশ্যই দলাই লামার স্বর্গারোহণ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হবে না এমনটা ধরে নেওয়া যায়। অরুণাচলপ্রদেশের টোয়াং অঞ্চলের ওপর চীনের সবিশেষ লিপ্সা রয়েছে। কালক্রমে যা বেড়ে চলেছে এমনকি চীন এই অঞ্চলটিকে দক্ষিণ তিব্বত বলে অভিহিত করে আসছে। এই কারণেই টোয়াং প্রশ্নে সীমান্ত আলোচনা বারবার ধাক্কা খাচ্ছে। নিজেদের একান্ত কথাবার্তায় চীন এমনটাও ইঙ্গিত করেছে যে টোয়াং ও আকসাই চীনের ওপর ভারত তার অধিকার ছেড়ে দিলে চীন ভারতের অরুণাচল প্রদেশ সহ অন্য সব দাবী মেনে নেবে। চীনের কাছে টোয়াং-এর এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে ১৯৬০ সালের 'খাম্পা আন্দোলন' এই টোয়াং থেকেই শুরু হয়েছিল। পুরানো কর ও জমিজমা সংক্রান্ত কাগজপত্রে টোয়াংকে তিব্বতের অংশ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। সেই কারণেই চীনের আশঙ্কা ভবিষ্যতে তিব্বতে কোনও বিদ্রোহ আপনা থেকেই দানা বাঁধতে পারে।

এখানে বলা প্রয়োজন ভারতের সামরিক প্রস্তুতি বিগত দু' দশকে কিছুটা সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও সামান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়া প্রায় নিশ্চল অবস্থায় রয়েছে। সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা যায় ভারতের প্রস্তুতি দুঃখজনকভাবে অপর্যাপ্ত। ১৯৮৮ সালের সুপারিশ অনুযায়ী কেবলমাত্র অতি নগণ্য কিছু বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে এ্যান্টনি স্বয়ং মেনে নিয়েছেন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে দেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। চীন পরিকাঠামো ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতায় আমাদের ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। এরই পরিণতিতে কেউ অবলীলায় টোয়াং গ্রাস করে ফেলেছে কেউ বা কার্গিলে অনায়াসে অ্যাডভেঞ্চার করতে সাহস পাচ্ছে। অবস্থা এককথায় নড়বড়ে।

এর বাইরেও চীনের প্রাচীন দার্শনিক কনফুসিয়াসের দর্শন অনুযায়ী চীন ঠিক করেছে ভারতকে সীমান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে জর্জরিত রেখে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেই আটকে রাখতে। ওদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাশকতাবাদী শক্তিগুলিকে যথেষ্ট মদত দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে অস্থির অশান্ত করে তুলতে। তবে চীন প্রসঙ্গে ভারতের আপোষমূলক অবস্থান ও চীন উদ্ভূত সম্ভাব্য বিপদগুলিকে খাটো করে দেখার প্রবণতার দু'টি কারণ আছে। (১) ১৯৬২ যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয় এবং দু'টি ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া জনিত আশঙ্কা। (২) নিউ দিল্লীর No first use অর্থাৎ যতই যুদ্ধ হোক না কেন আমি প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করব না এই চুক্তিতে সই করার পর দু'টি ফ্রন্টে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত রাখার মতো পর্যাপ্ত সংস্থান এখনও পর্যন্ত নেই। অপরদিকে যে অঞ্চলের ওপর চীন তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের বিষয়ে তার চুক্তি মোটেই পরিষ্কার নয় অর্থাৎ চালিয়ে দিলেও দিতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উল্লেখিত দুর্বল জায়গাগুলি ছেড়ে অন্যদিকে নজর ফেরাতে হবে যা এখন পর্যন্ত অপরীক্ষিত। ভিয়েতনামের উদাহরণ এক্ষেত্রে আদর্শ (১৯৭৯-তে যে শিক্ষা তারা চীনকে দিয়েছে তার পরিণতিতে পিপলস লিবারেশন আর্মি (পি এল এ) আর যুদ্ধ করার হিম্মত দেখাতে পারেনি)। তাইওয়ান ও তিব্বতে বিরোধিতা জোরদার করা দরকার। অন্যদিকে মালাক্কা খঁড়ি ও মায়ানমারের তীরবর্তী অঞ্চলে চীনের জাহাজগুলিকে ভাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সঠিক জায়গায় চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। দেরীতে হলেও হ্যানয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় যে অবমাননাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাকে শুধু আটকালেই হবে না, চীনের কাছে নতুন করে আর ইজ্জত খোয়ানোর অবকাশ নেই।

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন লী একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কেবলমাত্র দ্বিপাক্ষিক ব্যবসাবাণিজ্যের বৃদ্ধি ও উন্নতি হলেও তা উদ্বেগের প্রশমন ঘটায় না বরং তীব্র প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীদের মধ্যে নতুন উদ্বেগ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাতাবরণ তৈরি করে। আজকের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশ্বায়নের দুনিয়ায় কোনও একটি দেশ একা একাই উন্নতি করতে পারে না। সদ্য সমাপ্ত পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে সেই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। সেই কারণেই চীনের উত্থান কেবল মাত্র ভারতেরই মাথাব্যথার কারণ নয়। আমেরিকার বেজিং-এর কাছে পুঞ্জীভূত দেনার পরিমাণ বিপুল আর যে বেজিং ২০২০ সালে আমেরিকার অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাবে বলে অনুমিত। একইসঙ্গে আমেরিকার সামরিক খরচ ১৯৪০ খৃঃ থেকে সর্ব নিম্নে এসে ঠেকেছে। এই আপাত অবনমন সত্ত্বেও আমেরিকাকেই প্রধান শক্তিধর বলে ধরা হবে। এই সূত্রেই ভারতকে ভারতের মতোই মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

(সৌজন্যে : দি পাইওনীয়ার)

আমরি কাণ্ডে এরাজ্যে বেসরকারি চিকিৎসার বাণিজ্যিকিকরণের নগ্ন রূপটাই ফুটে উঠেছে

অর্ণব নাগ

বেসরকারি হাসপাতালে রোগী ভর্তি করার অভিজ্ঞতা যাঁদেরই রয়েছে, তাঁরা খুব ভালভাবেই জানেন, টাকা লুঠতে এমন কোনও হীনবৃত্তি নেই যা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবলম্বন করেন না। সামান্য অসুস্থ রোগীকে আই সি ইউ, আই সি সি ইউ-তে স্থানান্তরিত করে অধিক মুনাফা লোটার জন্য সেই রোগীটিকে মরণাপন্ন করে তুলতেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বাধে না। ঢাকুরিয়ায় সাম্প্রতিকতম আমরি কাণ্ডের পর এই ব্যাপারগুলো প্রকাশ্যে আসছে বটে, এবং জনমানসেও বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, এতদিন এই জিনিসগুলো রাজ্যবাসীর কাছে কোনও গুরুত্বই পায়নি। কারণ সংবাদমাধ্যমে এনিয়ে হইচই হয়নি। একটা কথা স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার, ২০০৮ সালের ১১ জানুয়ারি মাঝরাতে বড়বাজারের নন্দরাম মার্কেট কিংবা ২০১০ সালের ২৩ মার্চের দুপুরে পার্ক স্ট্রীটের স্টিফেন কোর্টে আগুন লাগা আর ২০১১-এর ৯ ডিসেম্বর ভোররাতে ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালে আগুন লাগা এক জিনিস নয়। একে বহু পুরনো জরাজীর্ণ দীর্ঘকালের মেরামত না হওয়া বাড়ি, তায় নানা শরিকী প্রচেষ্টায় আইনী-বেআইনি পথে যত্রতত্র লাগানো মিটারবক্স, তেল-কালি ভুসো মাখা বিদ্যুতের তার থেকে শট সার্কিট হয়ে আগুন লাগার সম্ভাবনাময় জতুগৃহ এ শহরে বড় একটা কম নেই। ঘিঞ্জি পরিবেশে দাহ্য বস্তু জড়ো করে রাখার কারণেও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ভবনে আগুন লাগা তাই আজ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আগুনের করাল গ্রাসে কোথাও একটু বেশি ক্ষতি এবং জীবনহানি হলে যাও-বা তদন্ত-টদন্তের চেষ্টা চরিত্র হয়, আর কোনও ক্ষতি সেভাবে প্রকাশ্যে না এলে ব্যাপারটা স্রেফ চেপে যাওয়া হয়। এটা মনে রাখা দরকার, সুস্থ মানুষ এক ঘুমের ঘোরে না থাকলে আগুনের হাত থেকে বাঁচতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেই। কিন্তু আমরির যে ৯৩টি প্রাণ অকস্মাৎ ঝরে গেল, বাঁচার চেষ্টাটুকু করার ক্ষমতাও যে তাঁদের ছিল না। কারণ তাঁরা দেহের অসুস্থতাকে সুস্থ করার জন্যই হাসপাতালে এসেছিলেন; ইতিহাস বইয়ের পাতার 'অন্ধকূপ হত্যা'কে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করতে নয়।

'আমরি'তে অগ্নিকাণ্ডকে যদি কলকাতার জতুগৃহ চিহ্নিতকরণের দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে সঠিক বিচার করা হবে না। বরং এই মর্মান্তিক ঘটনা বেসরকারি হাসপাতালের বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির যে নগ্নরূপ জনসমক্ষে উন্মোচিত করেছে তার দৃষ্টিতেই পুরো ব্যাপারটা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল' নীতি অনুসৃত হচ্ছে বাম-জমানার প্রায় মধ্যপর্ব থেকে। তবে শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ যেভাবে সংবাদমাধ্যমে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে, সে তুলনায় স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকিকরণ সংঘটিত হয়েছে একেবারে নিঃসাড়েই। এপ্রসঙ্গে একটা কথা মাথায় রাখা দরকার, বর্তমানে অর্থনীতির যেভাবে বিশ্বায়ন ঘটেছে এবং উদার অর্থনীতির যুগ এসেছে তাতে সরকারের কাছে একার পক্ষে সবকিছু দেখভাল করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই বেসরকারিকরণের মানে এই নয় যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার ক্ষেত্রেও মুনাফাবোধটাই সর্বাগ্রে কাজ করবে; মানবিকতা বা অন্য কিছু নয়।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, বাম জমানায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যেও মুনাফালোভীদের প্রভূত বিনিয়োগ থাকায় তা অনিবার্যভাবেই বাণিজ্যিকিকরণ বা কমার্শিয়ালাইজেশনের আওতায় এসে পড়েছে। সবচেয়ে যেটা খারাপ ব্যাপার হলো, পেশাদারী মানসিকতার পরিবর্তে যে মুনাফাবৃত্তির পরিচয় বেসরকারি হাসপাতাল মালিকরা অতীতে দিয়েছেন এবং বর্তমানেও দিচ্ছেন তা প্রশাসনিক উদাসীনতা ও নৈরাজ্যেরই প্রমাণ দেয়। আমরি কাণ্ডের পর প্রশাসনের সম্বিৎ ফিরলে অবশ্য অন্য কথা। কলকাতা শহর ও তার আশপাশে একের পর এক বিলাসবহুল যে হাসপাতালগুলো বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে, ব্যবসায়িক মুনাফা লুঠতে রোগীর জীবনটাই সেখানে বাজি ধরা হয়। প্রায় প্রতিদিন বিনা দরকারে অসংখ্য ব্যায়বহুল মেডিকেল টেস্ট একাধিকবার, অনবরত ওষুধের বিল বাড়িয়ে, 'ভাল ট্রিটমেন্ট'-এর নামে আই সি ইউ, আই সি সি ইউ-তে বিনা কারণে রোগীকে দিনের পর দিন ফেলে রেখে সেই বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা, দরকারে রোগীকে মরণাপন্ন করে চিকিৎসার সময়কে প্রলম্বিত করে আরও বেশি মুনাফা আদায় --- এটা বেসরকারি হাসপাতালের অতি পরিচিত চিত্র। এসব তো তাও নামীদামী হাসপাতালের কথা। অলিতে-গলিতে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো যে বেসরকারি নার্সিং হোমগুলো গজিয়ে উঠছে সেখানকার পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। একে তো পরিকাঠামোর অভাব, তায় অনেকক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসায় সামান্য রোগগ্রস্ত মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবার ঘটনা সেখানে আকছারই

ঘটছে। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরিতে সংগঠিতভাবে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, প্রতিটি বেসরকারি নার্সিং হোমে বিক্ষিপ্তভাবে সেই একই হত্যাকাণ্ড দিনের পর দিন।

এর দায় সরকারি হাসপাতালগুলো কোনওমতেই এড়াতে পারে না। যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে এদের অবস্থান, তাতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে মানুষের দায় পড়তো না যেচে বেসরকারি হাসপাতালে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার। কিন্তু বামফ্রন্ট জমানায় কোনও এক রহস্যময় (?) কারণে বেসরকারি নার্সিংহোম মালিকদের সঙ্গে দারুণ সখ্যতা গড়ে তোলা হয়েছে (বোধহয় পার্টি ফাণ্ডের কথা ভেবেই); অন্যদিকে সরকারি হাসপাতাল-গুলোকে এদের অঙ্গুলিহেলনেই কি না কে জানে, হাঁড়ির হাল করে দেওয়া হয়েছে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি কতটা দড় হতে পারে, বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে চাক্ষুষ দর্শনেই তা মালুম হবে। সরকারি হাসপাতালে যে ঢিলেঢালা ভাব থাকে তাতে কোনও খুনী কোনও রোগীকে মেরে আসতে চাইলেও বাধা দেবার কেউ থাকবে না। আর বেসরকারি নার্সিং হোমে আপনার মরণাপন্ন বাবাকে দেখতে গেলেও নিরাপত্তারক্ষীদের মুখঝামটা সহ্য করতে হবে।

দুটো ব্যাপারই অত্যন্ত অমানবিক, উদ্বেগের। আমরি-র ক্ষেত্রে ঠিক দ্বিতীয়টাই ঘটেছে। রাত আড়াইটার সময় আগুন লাগার পর অনেক অসুস্থ রোগী বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, হাসপাতালে থাকা রোগীর আত্মীয়রা এবং আশপাশের মানুষও আগুন লাগতে দেখে আমরির ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনওটাই হয়নি, হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের বাধায়। নাহলে হয়তো আরও কিছু প্রাণকে বাঁচানো যেত।

প্রশ্নটা এখানেই। বেসরকারি হাসপাতালের ভেতরে কর্তৃপক্ষের কুকীর্তি ধামাচাপা দিতে গিয়ে প্রায়শই বলি হচ্ছেন সাধারণ রোগী। নানান দাহ্য বস্তু থেকে শট সার্কিট— বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে আগুন লাগার অনেক কারণই আমরি কাণ্ডের পর প্রকাশ্যে আসছে। কিন্তু এর সঙ্গে আরও যেগুলো প্রকাশ্যে আসা দরকার ছিল যে, রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অমানবিক ব্যবহার, যথা ভুল চিকিৎসায় সুস্থ হতে যাওয়া রোগীকে মরণাপন্ন করে তুলে তার দায় নিতে না চাওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে তাকে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত করা, রোগী মারা যাবার পর বকেয়া টাকার পরিমাণ আচমকা দু-তিনগুণ করে দেওয়া এবং বকেয়া না মেটালে দেহ আটকে রাখা, সর্বোপরি দামী ওষুধ ও বিভিন্ন মেডিকেল টেস্টের ভুয়ো খরচ দেখিয়ে রোগীর আত্মীয়দের কাছ থেকে অত্যন্ত হীন উপায়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় ইত্যাদি। মুশকিল হলো, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এগুলো সবই জানেন। আমরি কাণ্ড তাঁদের টনক কতটা নাড়াবে তা সময়ই বলবে, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁরা এতকাল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সেজে বসে না থাকলে আমরি কেন, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে যাওয়া বহু রোগীকেই বাঁচাতে পারতেন।

আমরির মর্মান্তিক কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক। মাথায় রাখা দরকার যে, ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালটি ছিল সমস্ত রকমের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সুযোগ-সুবিধাযুক্ত। অন্তত যে পরিমাণ টাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবার থেকে আদায় করে থাকেন তাতে বিলাসবহুল চিকিৎসা পরিষেবাই কাঙ্ক্ষিত। অথচ বাস্তবে আমরা কি দেখলাম? প্রয়োজনের চরম মুহূর্তে আগুন নেভানোর বিশেষ যন্ত্র স্প্রিঙ্কলার কাজ করলো না, অকেজো হয়ে গেল স্মোক ডিটেক্টরও। এই 'স্মোক' কেন হলো? কারণ দমকলের বিধি নিষেধের তোয়াক্কা না করে এমনকী নভেম্বরেই দমকলের সময়সীমা ফুরিয়ে গেলেও ৯ ডিসেম্বরের অভিশপ্ত রাতে বেসমেন্টের স্টোররুম জুড়ে ছিল প্রচুর তুলো, বাতিল বিছানা, পিভিসি পাইপ এবং কাঠের বাক্স ও প্লাইউড। ওই তুলো থেকেই ধোঁয়া হয়। যে বিলাসবহুল চিকিৎসার অঙ্গীকার করে আমরি কর্তৃপক্ষ লাখ লাখ টাকা রোগীর পরিবারের কাছ থেকে কামাচ্ছেন, সেখানে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কোনও নামগন্ধ নেই, ভাবা যায়! অযোগ্য, অগ্নিনির্বাপনের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধ্যান-ধারণাহীন কর্মীদের দিয়ে আগুন লাগার পর মূল্যবান ঘন্টা দু'য়েক সময় নষ্ট করে আগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে মাঝখান থেকে নার্সিং হোমের একতলা থেকে ছয়তলা ধোঁয়ায় ভরিয়ে ফেলল, আর তাদের এই অপকর্ম ঢাকতে আশপাশের মানুষজন ও রোগীর আত্মীয়কে ঢুকতে না দিয়ে এবং সেইসঙ্গে দমকল ও পুলিশকে না জানিয়ে আক্ষরিক অর্থেই তাঁরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। আর এই অপরাধের 'প্রেরণা' যে আমরি-র কর্তারাই গত ১৩ ডিসেম্বর আমরি কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর দুঃসাহসের মধ্যেই তা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

এখানেই খুব সঙ্গতভাবে একটা প্রশ্ন উঠে আসছে এই যে, মানুষের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, তার পুরোটাই কি মুনাফা? রোগী স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যেটুকু নজরদারি, সেটা কি স্রেফ দেখনদারি? জরুরি আপাতকালীন অবস্থায় সরকারি পরিকাঠামোর প্রাথমিক সাহায্যই বা তাদের লাগবে কেন? সেই অযোগ্য কর্মীদের দিয়ে নিজেদের পরিকাঠামোহীনতার গাফিলতি ঠেকাতে আগুন নেভাতে গিয়ে যে হিতে বিপরীত ঘটিয়েছেন আমরি কর্তারা, তার জন্য তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অবশ্যই হওয়া উচিত।

কিন্তু আমরি হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান তো নয়ই, এমনকী অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতালকে ভয় দেখানোর মতোও কোনও পদক্ষেপ নয়। ধৃত আমরি কর্তাদের উপযুক্ত শাস্তিই একমাত্র স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকিকরণের বিরুদ্ধে সদর্থক পদক্ষেপ হতে পারে। তবে ইতিহাসের সাক্ষ্য, মানুষের প্রাণঘাতকরা এই দেশে ইতিপূর্বে অনেকবারই বেকসুর খালাস পেয়েছেন। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে মেধাসম্পন্ন ছাত্ররাই ডাক্তারী পড়তে আসেন এবং স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকিকরণের নোংরা 'সিস্টেমে' মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের (এদের অনেকেই আবার ডাক্তার) ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে হৃদয়টাই বিসর্জন দিয়ে বসেন। এর প্রতিবিধান বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে খুঁজে বের করাটা সত্যিই শক্ত। স্বাস্থ্য-ব্যবসা রুখতে কঠোর আইন ও কড়া নজরদারির পাশাপাশি প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারাও জরুরি। তবে চিহ্নিত দোষীদের বেকসুর খালাস যে এই স্বাস্থ্য পরিস্থিতির অবনমন ঘটাবে তা বলাই বাহুল্য। আর দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি বাণিজ্যিকিকরণের লাগাম কিছুটা হলেও আশা করা যায় টেনে ধরতে সক্ষম হবে। নইলে আমরি কর্তৃপক্ষের মৃতদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা 'ঘুষে'র (একে ঘুষ ছাড়া অন্য কিছু বলতে প্রতিবেদক অপারগ, কারণ মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ টাকা দিয়ে হয় না) প্রস্তাব কিংবা মৃতদের পরিবারের একজনের জন্য রাজ্য সরকারের চাকরির প্রস্তাবে অকাল মৃতদের আত্মা শান্তি পাবে না।

এরাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আজ নিজেই অসুস্থ

নবকুমার ভট্টাচার্য

এরাজ্যের চালু সমাজব্যবস্থায় চিকিৎসা পরিষেবা পণ্যমাত্র। এখানে রোগী ক্রেতা, ডাক্তারের পরিচয় বিক্রেতার। চিকিৎসক তাঁর জ্ঞান বিক্রি করেন এবং রোগী তার জন্য ডাক্তারকে অর্থ ধরে দেন। সরকারি পরিষেবায় কিছু জিনিস বিনামূল্যে পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সেটা খুব সামান্য। না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এন আর এস, এস এস কে এম, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, আর জি কর সর্বত্র একই অবস্থা। হাসপাতালের বিরুদ্ধে রোগীর পরিজনদের রয়েছে ওষুধ ও অন্যান্য পরিষেবা না দেওয়ার অভিযোগ। এ সমস্ত অভিযোগ যে অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা নয়— হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে চিকিৎসকেরা অনেকেই এই কথা স্বীকারও করেন। তবে চিকিৎসকদের মতে, হাসপাতালে যত রোগী আসেন তাঁদের সবাইকে সব সময় সুস্থ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে চিকিৎসক নিগ্রহ ঘটে থাকে। কর্মবিরতিও চলে। আই এম এ-র রাজ্য শাখার প্রাক্তন প্রধান ডাঃ সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'চিকিৎসক নিগ্রহ যেমন মেনে নেওয়া যায় না, তেমনই কোনও পরিস্থিতিতেই হাসপাতালে ডাক্তারদের কর্মবিরতিও সমর্থন যোগ্য নয়।' আসলে চিকিৎসা- ব্যবস্থার অস্বচ্ছতার জন্যই এই ঘটনা ঘটছে। অধিকাংশ রোগীর আত্মীয়ের অভিযোগ হাসপাতালে বেড থেকে ওষুধ সব ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন। হাসপাতালে অনেক কিছুই থাকে না, কিন্তু তার মধ্যেও কী আছে সে ব্যাপারে স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন। হাসপাতালে যদি স্পষ্ট করে লিখে রাখা হয় রোগীর জন্য সেই মুহূর্তে ঠিক কোন কোন পরিষেবা রয়েছে তাহলে মনে হয় রোগী-ডাক্তার বিরোধ মিটলেও মিটতে পারে। তবে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যখন আত্মীয়রা উদ্বিগ্ন থাকেন তখন আশ্বস্ত করার বদলে অধিকাংশ ডাক্তারই খারাপ ব্যবহার করেন। রোগ, চিকিৎসা ও ওষুধ-বিষুধ নিয়ে কিছু জানতে চাইলে অথবা কোনও ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলে তাঁরা রেগে যান। আর গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবস্থা তো আরও খারাপ। সেখানে অর্ধেক দিন ডাক্তারই থাকেন না। গ্রামে এখনও প্রতি ৩.২ গ্রাম পিছু একজন চিকিৎসক। আর এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে গেলে একজন গ্রামীণ মানুষকে গড়ে ৪ কিলোমিটার হাঁটতে হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার (WHO) সুপারিশ আছে

প্রতি ৩০০ জনের চিকিৎসার জন্য একটি 'বেড'। কিন্তু এই রাজ্যে ১১৫০ জন প্রতি ১টি 'বেড'। জাতীয় গড়— ৯০০ জন প্রতি ১টি 'বেড'। শিশুদের রক্তাল্পতার আধিক্যে ২৫টি প্রধান রাজ্যের মধ্যে এই রাজ্য ১৯তম স্থানে। অমর্ত্য সেন সম্পাদিত প্রতীচী স্বাস্থ্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পান এমন মানুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে ২৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২৪ শতাংশ। প্রতীচী ট্রাস্টের রিপোর্ট বলছে যে রাজ্যে প্রতি ৪২,২০৪ জন মানুষ একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে— যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। থাকা উচিত সাধারণ এলাকায় ৩০ হাজার। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের 'গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমীক্ষা' রিপোর্ট বলছে রাজ্যে ১৭৪৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১০৬৯ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রায় সাড়ে বারো হাজার স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি রয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালে প্রায় ১২০০ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন এই মুহূর্তে। এরাজ্যে বাড়িতেই প্রসব হয় ৫৮ শতাংশ গর্ভবতী মায়ের, যার মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ কোনও স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রসবের সময় পাশে পান। সরকারি হাসপাতালগুলিতে সদ্যোজাত শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে এক বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে— একই শয্যায় দুই/ তিনজন মা ও শিশুকে রাখা হয়। কোথাও নোংরা জেনেও জলকাদার মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বুক বা হাড়ের এক্সরে করাতে ২৮ থেকে ১২০ দিন, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করাতে ২১ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। শহরের হাসপাতালে যেসব রোগী আসেন, তাঁদের মধ্যে ২৫ শতাংশ রোগী বা তাঁদের পরিবার ৩ থেকে ১০ দিন হাসপাতাল চত্বরেই কাটান। ৩৪ শতাংশ রোগী বলছেন, তাঁরা চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখাই করতে পারেননি। তবুও এই রাজ্য স্বাস্থ্য বিষয়ে কোনও পৃথক মন্ত্রী নেই! মুখ্যমন্ত্রী অনেক বিষয়ের সঙ্গে এই দপ্তরটিও 'দেখাশোনা' করেন মাত্র।

গোটা স্বাস্থ্যপরিষেবা ব্যবস্থায় রোগী ও চিকিৎসক ছাড়াও আরও দু'জন রয়েছে। ওষুধ কোম্পানি, স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ী এবং সরকার। স্বাস্থ্য-পরিষেবা খারাপ হওয়ার নেপথ্যে এদের

ভূমিকাও কিছু কম নয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের জন্যও এদের ভূমিকা রয়েছে। সারা দেশেই ডাক্তারদের চালায় ওষুধ কোম্পানি আর প্রাইভেট ক্লিনিক। কারণ ওষুধ বেচে ওষুধ কোম্পানির লাভ। চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বেচে লাভ বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম ও ক্লিনিকের। ওষুধ কোম্পানি এবং প্রাইভেট ক্লিনিকের সঙ্গে চিকিৎসকদের 'সুসম্পর্ক' রয়েছে। এই সুসম্পর্কের জেরেই বিশ্বের বাজারে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া ওষুধ এদেশে রমরমিয়ে চলে। প্রাইভেট ক্লিনিকের সঙ্গেও সম্পর্কটা দেওয়া-নেওয়ার। এক্ষেত্রে জনসাধারণের ভূমিকা নিতান্তই রোগীর। আর সরকারের ভূমিকা কী? সরকার স্বাস্থ্য-বাজারকে মজবুত করতে স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ী ও ওষুধ কোম্পানিগুলিকেই মদত দেয়। তাদের সুবিধার জন্য আইন হয়, আইনের সংশোধনও হয়। সরকারি হাসপাতালে দালালরাজ চলে। দুর্নীতির ফোয়ারা চলে। সরকার দেখেও তা দেখে না। জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসক নার্স কম। তবু আরও বেশি চিকিৎসক তৈরি করা হয় না। পরিকাঠামোর উন্নতি হয় না, কারণ তাহলে স্বাস্থ্য-বাজার টিকবে না। এই বাজার যারা চালায়, তারা সব রাজনৈতিক দলকেই বিরাট অঙ্কের চাঁদা দেয়। রাজনৈতিক দলই সরকার চালায়। তাই কেউ কাউকে ঘাঁটায় না। সরকারি হাসপাতালে দৈন্যদশা সৃষ্টি করতে না পারলে মানুষ নার্সিংহোমে যাবেন কেন?

সরকার স্বাস্থ্য-বাজারকে মজবুত করতে স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ী ও ওষুধ কোম্পানিগুলিকেই মদত দেয়। তাদের সুবিধার জন্য আইন হয়, আইনের সংশোধনও হয়। সরকারি হাসপাতালে দালালরাজ চলে। দুর্নীতির ফোয়ারা চলে। সরকার দেখেও তা দেখে না। জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসক নার্স কম। তবু আরও বেশি চিকিৎসক তৈরি করা হয় না। পরিকাঠামোর উন্নতি হয় না, কারণ তাহলে স্বাস্থ্য-বাজার টিকবে না। এই বাজার যারা চালায়, তারা সব রাজনৈতিক দলকেই বিরাট অঙ্কের চাঁদা দেয়। রাজনৈতিক দলই সরকার চালায়। তাই কেউ কাউকে ঘাঁটায় না। সরকারি হাসপাতালে দৈন্যদশা সৃষ্টি করতে না পারলে মানুষ নার্সিংহোমে যাবেন কেন?

অধিকাংশ গ্রামীণ হাসপাতালেই পরিকাঠামো নেই। ওষুধ নেই, রোগীদের পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নেই। তাই ডাক্তারও থাকেন না। গ্রামীণ হাসপাতালগুলির উন্নতি ঘটলে শহরের হাসপাতালগুলির চাপ কমবে। কিন্তু তা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ সরকার বেসরকারি কর্পোরেট স্বাস্থ্যব্যবসায় মদত দিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলির চিকিৎসাক্ষেত্রে 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' নীতিই চলে। কিন্তু সেখানে সব ঠিক-ঠাক মানা হয়। সেখানে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রটি চূড়ান্ত পরিকল্পিত ও সুরক্ষিত। জনস্বাস্থ্যকে ঠিকঠাক রাখার জন্য সেখানে কঠোর আইন রয়েছে এবং সরকার তা প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকা কিছু হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারদের সময়ে আসা কিছুটা নিশ্চিত করেছেন মাত্র, কিন্তু পরিকাঠামোগত কোনও উন্নতি এখনও হয়নি।

ঈশ্বরকণার খোঁজে ঋক্‌বেদে

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গোটা বিশ্বজুড়েই পদার্থবিজ্ঞানীদের এখন তুমুল ব্যস্ততা। খোঁজ চলছে হিগস বোসন (Higgs boson)-এর। পদার্থবিজ্ঞানীরা বলছেন, হিগস বোসন আসলে একটি মৌলিক কণা। যদিও এই মৌলিক কণাটি এখনও অনাবিষ্কৃত। তবে কণা পদার্থবিজ্ঞানের (Particle Physics) স্ট্যান্ডার্ড মডেলে (এস এস)-এর অস্তিত্ব অনুমান করছেন বিজ্ঞানীরা। আপাতত এই অনুমান নিশ্চিত করার মুখে গবেষকরা। তবে স্রেফ অনুমানেই বা কম কি? ইতিমধ্যেই হিগস বোসনকে ঈশ্বর কণা আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ তাঁরা মনে করছেন, হিগস বোসন আবিষ্কৃত হলেই সৃষ্টি রহস্যের সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে যাবে বিজ্ঞান। ঈশ্বর বনাম বিজ্ঞানের তথাকথিত লড়াইয়ের অবসান ঘটবে। বরং ঈশ্বরকে 'আবিষ্কারে'র কৃতিত্ব বিজ্ঞানের মুকুটে আরও একটি সোনালি পালক যোগ করবে। পদার্থবিজ্ঞানীরা এও মনে করছেন, ঈশ্বরকণা আবিষ্কৃত হলে তাঁদের সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে সেটা হলো মহাবিশ্ব যদি 'উত্তর' হয়, 'প্রশ্নটা' তবে কি?

'উত্তর' খোঁজার কাজটা যখন একপ্রকার কেল্লাফতেই করে ফেলেছেন আপামর বিশ্বের বিজ্ঞানীরা, তখন 'প্রশ্ন'টাও যে 'উত্তরে'র মধ্যেই লুকিয়ে আছে— এমনটাই দাবী করছেন পদার্থবিজ্ঞানী বিবেক শর্মা। বিহারের মুজফফরপুরে জন্ম এবং বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী-গোষ্ঠীর নেতৃত্বে থাকা বিবেক প্রমাণ করে দিয়েছেন, 'প্রশ্নটা' হলো ঋক্‌বেদ, যার মধ্যে আধুনিকতম পদার্থবিজ্ঞানের হিগস বোসনের 'উত্তরটা' লুকিয়ে রয়েছে। পুণের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং পরে কানপুর আই আই টি-র কৃতী ছাত্র বিবেক জানাচ্ছেন— তাঁর সংস্কৃত স্কলার মায়ের থেকে ঋক্‌বেদের স্তোত্রগুলি শেখার পর কণা পদার্থবিজ্ঞানে'র মাধ্যমে তা যাচাই করে নেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, ঋক্‌বেদের সেই স্তোত্রের কথা, যেখানে সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাকাশের উৎসের কথা বলা হয়েছে এবং একটা সময়ের কথা বলা হয়েছে যখন জগতের সবকিছুই মহাশূন্যে আকৃতিবিহীন অবস্থায় বিরাজ করে। ঋক্‌বেদের এই স্তোত্রই শেষ পর্যন্ত চমৎকৃত করে বিবেক শর্মাকে। তাঁর বক্তব্য, ''আমি দারুণ আশ্চর্য হয়ে যাই। এই ঘটনা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ কিনা আমাদের সৃষ্টি রহস্যের সন্ধান করার কথা ভেবেছিলেন!'' সানদিয়োগোয় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং একটি ইউরোপীয় গবেষণাগার সি ই আর এন-এর হিগস বোসন অনুসন্ধানকারী দলের প্রধান হিসেবে শ্রী শর্মা অতঃপর নিজের মায়ের কাছ থেকে শেখা ঋক্‌বেদের স্তোত্রের মধ্যেই ঈশ্বর কণার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে সেই পথেই তাঁর গবেষণাকে চালিত করেন।

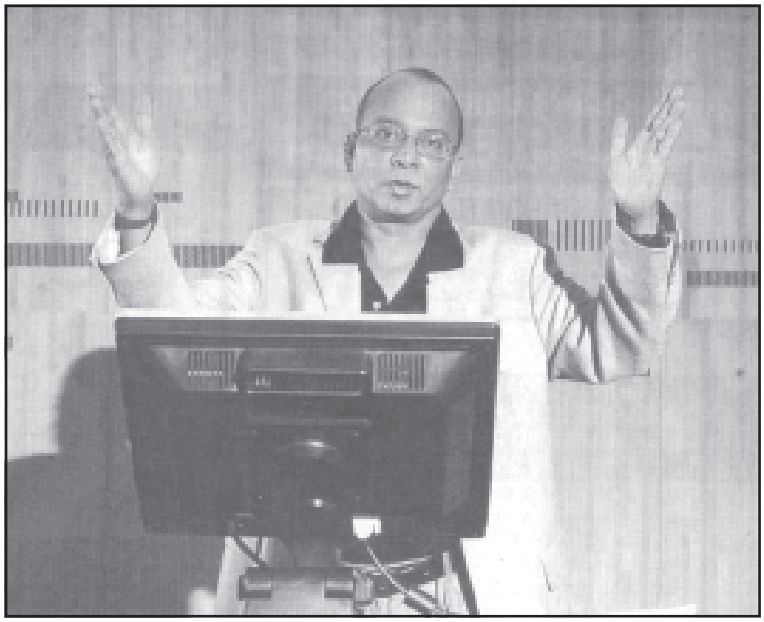

পদার্থ বিজ্ঞানী বিবেক শর্মা : তাঁর গবেষণাই পথ দেখিয়েছে ঋকবেদে ঈশ্বর কণার অনুসন্ধান।

গত শতাব্দীর ছ'য়ের দশকের গোড়া থেকেই হিগস বোসনের অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৮৪-তে আমেরিকায় গবেষণার জন্য গিয়েছিলেন শ্রী শর্মা।

১৯৯০-এর দশকের প্রথমদিকে তাঁর নেতৃত্বাধীন সি ই আর এন-এর গবেষকদল দু'টি নতুন আণবিক কণা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় যার মধ্যে একটি ছিল প্রোটনকণার সহযোগী, যদিও সেটি প্রোটনের থেকে অন্ততঃ পাঁচগুণ ভারি। তখন থেকেই হিগস বোসন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলেন বিবেক শর্মা।

প্রসঙ্গত, অনেক বিজ্ঞানীই সুদীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে ঈশ্বর কণার অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে তার অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিহান হয়ে ওঠেন। তবে বিবেক শর্মার গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে ভারতবর্ষের সনাতনী শাশ্বত ধারার প্রতীক ঋক্‌বেদের সেই চিরন্তন, চিরাচরিত স্তোত্রের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ঈশ্বর কণার অস্তিত্ব। যাকে বের করে আনাই এখন একমাত্র কাজ পদার্থ বিজ্ঞানীদের।

সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিপীড়িত মহিলাদের ব্যাপারে সবাই চুপ কেন?

বাসুদেব পাল।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী রাজ্য মণিপুরকে অশান্তির ভরকেন্দ্র বললে কোনও অত্যুক্তি হয় না। বিগত কয়েক দশক যাবৎ মণিপুরের পরিস্থিতি এরকমই। কিন্তু অশান্ত পরিস্থিতিতে ঘৃণ্য অত্যাচারের শিকার রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মা-বোনেরা। তথাকথিত মানবাধিকারবাদী, নারীবাদীরা নিরাপত্তাবাহিনীর বাড়াবাড়ি নিয়ে যতটা সরব, তার শতাংশের একভাগও সন্ত্রাসবাদীদের বিপক্ষে নয়। এই সন্ত্রাসবাদীরা গ্রাম থেকে তোলা আদায় করছে এবং সেই সঙ্গে মা-বোনেদের উপর চরম অত্যাচার চালাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

অত্যাচারে পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়া মেয়েরা এবার এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছেন। এজন্য মণিপুরে সুপরিচিত ইম্ফলভিত্তিক নারী সংগঠন 'মিইরা পাইবিস' মা-বোনেদের উপর বিভিন্ন অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব। বিভিন্ন জেলার সংগঠিত করার ব্যাপারেও সক্রিয় মিইরা পাইবিস। মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা নাগা উগ্রপন্থী নেতা আইজাক চি স্যু এবং থুঙ্লাঙ্ মুইভার জন্মস্থান। নাগা জনজাতিদের সঙ্গে মার ও কুকি গোষ্ঠীর (জনজাতি) এক চিরন্তন বৈরিতা রয়েছে।

মার'দের মধ্যেও মহিলাদের সম্মানরক্ষার্থে কাজ করছে 'মার ওমেনস্ এসোসিয়েশন'। তারা ২০০৬ সালে একবার সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানতে পারেন যে, অন্ততপক্ষে ২৫ জন মার জনজাতির মা-বোনকে নির্যাতন, উৎপীড়ন এবং যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। এই জঘন্য কাজ করেছে তথাকথিত ভূমিগত উগ্রপন্থীরা। অত্যাচারিত যে তিনটি গ্রামের নাম কাগজে এসেছে তা হলো — পারবাং, মারখাওপুই এবং সিপুইকান। গ্রামবাসী নির্যাতিতারা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চূড়াচাঁদপুর জেলার তিপাইমুখ, হেংলেপ, থানলন, সাইকোট এবং সামুলামলান এলাকাগুলোকে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল বলেই ধরা হয়। তাদের ভূমিগত থাকার জায়গা। এই এলাকায় কম করেও ১৩টি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে যাচ্ছে। এক একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এক একটি পার্বত্য জনজাতি গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। এলাকার পরিস্থিতি বুঝেই ওখানে অসম রাইফেল মোতায়েন করা হয়েছে। ফলে কয়েকটি গোষ্ঠী সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসেছে। হয়েছে এস ও ও অর্থাৎ 'সাসপেনশন অফ অপারেশন' চুক্তি।

মাতৃজাতির সম্মানরক্ষায় জেলা সদর লামকা-তে সব সংগঠনকে একত্রিত এক ছাতার নীচে নিয়ে আসার কাজ করছে 'চূড়াচাঁদপুর জয়েন্ট ওমেনস্ ইউনিয়ন'। যার সভানেত্রী হলেন পাই জে এল স্বামী। এখানে উল্লেখ্য, 'পাই' বিশেষণটি সম্মানীয় বয়স্কা মহিলাদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। যে সময় তিপাইমুখের ধর্ষণ নিয়ে খোঁজখবর করতে 'ওমেন্স ইউনিয়ন' গ্রামে গ্রামে গিয়েছিল। তখন তাদেরও প্রাণনাশের হুমকী দেওয়া হয়েছিল। এমনকী স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম তাদের কাজের কড়া সমালোচনা করেছে। পাই সামী আরও জানিয়েছেন, তারা ধর্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। কমিশনের (মহিলা) পক্ষে মহিলা তদন্তকারী ছাড়া অন্য কোনও স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তার ছিল না। অত্যাচারিতাদের শুনানী ও পরীক্ষা তিপাইমুখ মহকুমার সদর পারবাং-এ হয়েছিল। পাল্টা পরীক্ষা করেছিল হিউম্যান রাইট এলার্ট (মানবাধিকার সংস্থা) এবং 'মণিপুর ফরোয়ার্ড ইয়ুথ ফ্রন্ট'। দুটি সংগঠনই উপত্যকাভিত্তিক অ-জনজাতি গোষ্ঠীর।

ঘটনার গতিপ্রকৃতিতে উদ্বিগ্ন মার ওমেন এসোসিয়েশন-এর নেত্রীবৃন্দ জাতীয় মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হন ২০০৬ সালের মে মাসেই। যাই হোক, তারা ধৈর্য ধরে মনোযোগ সহকারে মার মেয়েদের কথা শোনেন। তৎকালীন কমিশনের চেয়ারপার্সন গিরিজা ব্যাস ঘটনাকে গুরুত্ব দেন। তারা পাই সামীকে ডেকে পাঠান। পরে জাতীয় মহিলা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত মালিনী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তিপাইমুখে গিয়ে অত্যাচারিতা মেয়েদের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর রিপোর্টে ওই এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার চূড়ান্ত অনুপস্থিতির উল্লেখ করেছেন— 'ওখানে হাসপাতাল বা ডাক্তার কিছুই নেই।' জাতীয় মহিলা কমিশনের সুপারিশে ২০০৬ সালের নভেম্বরে পারবাং-এ বিনামূল্যে একটি চিকিৎসা শিবির এবং ট্রমা কাউন্সেলিং ক্যাম্প হয়েছিল। মহিলাদের সক্রিয়তার সুফল ওটুকুই।

ধর্ষিতাদের মনে আবার এইচ আই ভি/ এইডস্-এর ভীতি প্রকট রূপে দেখা দিয়েছে। কেননা, ধর্ষকদের বেশিরভাগই নিয়মিতভাবে ড্রাগে আসক্ত। পুনরায় ধর্ষিতা হওয়ার ভয় প্রচণ্ড। অনেকে মিজোরাম ও মেঘালয়ে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছে। সাধারণ গৃহস্থ মহিলাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন এখন ওই গ্রাম্য পরিবেশে আর সম্ভব নয়। বিয়ে করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সব আশায় জল ঢেলে দিয়েছে সন্ত্রাসী ধর্ষকরা— একথা জানিয়েছেন পাই সামী।

তাদের প্রচারের ফলে মার ওমেন এসোসিয়েশন কিছুটা উৎসাহ পেয়েছে। তবে আর্থিক ও আইনী সাহায্য সমর্থন খুবই কম।

এরপর ধর্ষিতা নাবালিকাদের মায়েদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা রয়েছে। তারা জানে না কোথায় চিকিৎসার জন্য যেতে হবে, কাকে গিয়ে কি বলতে হবে।

এখন স্থানীয় মেয়েরা সংগঠিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করছেন। অনেক স্থানীয় মহিলা সংস্থা সক্রিয় হয়েছে। এমন কয়েকটি সংস্থা হলো— মার ওমেন্স এসোসিয়েশন, জেমি মাদার্স এসোসিয়েশন, কুকি ওমেন্স এসোসিয়েশন এবং আইমা লেইমারেন অপুনবা লুপ। ইউনিয়নের মতে, প্রত্যেক অপরাধীকে তার জাতি-গোষ্ঠী-ভাষা না দেখেই দণ্ড দিতে হবে, কমপক্ষে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা। তাঁরা সুবিচার চান। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি মেয়েদের মানবাধিকার নিয়ে তথাকথিত মানবাধিকারবাদীরা কখনও সরব হয়েছে— এমনটা চোখে পড়েনি। আবার এরা নিরাপত্তাবাহিনীর ব্যাপারে অতিমাত্রায় সক্রিয়। যে শর্মিলা চানুরা সন্ত্রাসবাদীদের উৎপীড়নের শিকার তাদের কথা কে বলবে?

টানাটানির টাকায় ভাগাভাগির রাজনীতি

মাননীয় মমত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

দিদি, আপনার জবাব নেই। ২০১১ সালে দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে যদি জনপ্রিয়তার রিয়েলিটি শো হয় তবে আপনি নিশ্চিত টপার হবেন! আসলে জনপ্রিয় রাজনীতিই তো আপনার অস্ত্র। পেট্রোলের দাম কিংবা, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি সবেতেই জনপ্রিয়তা হরণ করায় সব্বাইকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন আপনি। এই একটি ব্যাপারে সব রাজনীতিকদের শিখতে হবে। না, আর একটা ব্যাপার আছে। সেটা তোষণ রাজনীতি।

আমরিতে আগুন, মদে বিষ এসবের মধ্যেও কিন্তু আপনি মুসলিম ভাইদের কথা ভোলেন না! এই তো সেদিন সংগ্রামপুরে বিষ মদের শিকাররা যখন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছেন তখন আপনি রাজারহাট-নিউটাউনে প্রস্তাবিত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে। প্রতিশ্রুতি দিলেন সংরক্ষণের যে প্রস্তাব আগের বাম সরকার এনেছিল, তাতে অনেক খুঁত ছিল। তাই ওই প্রস্তাব এখনও আইনে পরিণত হয়নি। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট আইন আনবে। ম্যাডাম, সবাই জানে যে, আগের সরকার মুসলিম সংরক্ষণ নিয়ে কতটা আন্তরিক ছিল। যদিও আপনি তা মানেন না। আপনার ধারণা ওবিসি কোটার আওতায় মুসলিম সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা যে প্রস্তাব এনেছিল, তাতে অনেক ভুলচুক ছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকার সেই ভুল করবে না। রাজ্যের তিরিশ শতাংশ মুসলিম বাসিন্দার আর্থিক পরিস্থিতি দেখতে সার্ভে শুরু হয়েছে। সার্ভে শেষ হলে এ ব্যাপারে বিল আনবে সরকার। তারপর তা আইনে পরিণত হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনিই জানিয়েছেন এত কথা। আরও প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, সরকারি চাকরিতেও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী আপনি এও জানিয়েছেন যে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার।

দিদি, যারা বিষয়টা পুরোপুরি জানেন না, তাঁদের জন্য একটু বলে দিই যে মুসলিম সমাজেরই অনেকে 'মাদ্রাসা' শব্দটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ঢোকানোর পক্ষে হলেও আবার অনেকের আশঙ্কা, ওই শব্দটি থাকলে চাকরির ক্ষেত্রে অসুবিধে হতে পারে। তাই তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম, সমবায় মন্ত্রী হায়দার আজিজ সফি, ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহাসিদ্দিকি ও টিপু সুলতান মসজিদের শাহি ইমামকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার নতুন করে তৈরি করছে ওয়াকফ বোর্ড। এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এর দায়িত্বে থাকবেন। হজ যাত্রীদের জন্য রাজারহাট-নিউটাউনে বারোতলা অত্যাধুনিক হজ হাউস তৈরি করা হবে। উত্তরবঙ্গের হজ যাত্রীদের সুবিধার্থে শিলিগুড়ি থেকেও হজযাত্রার ব্যবস্থা করা হবে। এতেও কিন্তু খুব একটা খুশি নন মুসলিমরা। কারণ, পাইয়ে দেওয়া মানুষের চাওয়া বাড়ায়। আর মানুষ নিয়েই তো সমাজ। আসলে এই পাইয়ে দেওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে মুসলিম সমাজকে অর্জন করার 'অভ্যাস' এবং 'ইচ্ছে' থেকেই যে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরনো সরকার যে কাজ করে এসেছে সেই পথেই হাঁটছেন আপনি। তাহলে পরিবর্তনটা কোথায় হলো?

এমনিতেই দেশটা সংরক্ষণের বোঝা নিয়ে ক্লান্ত। এরপর দিদি, আপনি পরিবর্তনের কাণ্ডারী, আরও কত ভাগ করবেন? পাহাড়ে গিয়ে গোর্খাদের ভাগ করে এসেছেন। তাদের জন্য আলাদা চাকরির সুযোগ দেবেন কথা দিয়েছেন, আদিবাসী সমাজের জন্য চাকরি থেকে শুরু করে নানা সুযোগ দেবেন বলেছেন, মুসলিম সমাজের জন্য তো কথাই নেই। একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। মানছি, সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশকে মূলস্রোতে নিয়ে আসতে এমন সুযোগ করে দিতেই হবে। কিন্তু মূল স্রোতে থাকা মানুষকে বঞ্চিত করারও তো অধিকার নেই কারও। আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের উদ্যোগ মানে সেখানে কিছু বিশেষ এলাকার উন্নয়ন বোঝায়। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে এই ভাগ বাঁটোয়ারার মারাত্মক দিকটা ভেবে দেখেছেন কি? এর ফলে রোটি-কাপড়া-মকানের লড়াইয়ে সমাজের বাকি অংশ যদি মুসলিম সমাজকে শত্রু পক্ষ ভাবতে শুরু করে তখন? তখন তাদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে দেবেন হয়তো, কিন্তু আগুন নিভবে না।

সব শেষে একটা কথা ভাববেন কি ম্যাডাম? ভাববেন কি দিদি? খাওয়া, পড়া, কর্মসংস্থানের দায়িত্ব না হয় সরকারের কিন্তু ধর্মাচারণে আর্থিক সহায়তার জন্য সরকারি কোষাগার খুলে দেওয়া কি সরকারের দায়িত্ব বা কর্তব্য হতে পারে?

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

চিঠিপত্র

জঙ্গলমহলে শান্তিপ্রক্রিয়া

মাওবাদী নেতা কিষেণজীর মৃত্যু অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিগত বাম সরকারের ভুল পদক্ষেপে মাওবাদী কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ার ফলে জঙ্গলমহলে যেন জঙ্গলরাজ কায়েম হয়েছিল। হিংসাশ্রয়ী রাজনীতিতে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ফলে জঙ্গলমহলের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। মাওবাদী সমস্যা তাই ক্রমশ জটিলতর আকার ধারণ করে। তাই রাজ্যে পালাবদলের ফলে বর্তমান সরকার জঙ্গলমহলে শান্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়। কিষেণজীর মৃত্যুতে সেকথা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। কারণ যে কোনও সংগঠনেরই নেতা বা নেত্রীর মৃত্যুতে সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হয়ে যায় না। তাই কিষেণজীর মৃত্যু কি জঙ্গলমহলে শান্তির বার্তা বয়ে আনবে? মাওবাদী কার্যকলাপের কি অবসান ঘটবে? না কি মাওবাদী সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হবে? এসব প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগতে পারে। তবে এ ঘটনায় হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হলেও খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো পরবর্তী সময়ে মাওবাদীরা আরও হিংস্র হয়ে উঠলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। নেতার শূন্যস্থান কখনও অপূরণীয় নয়। তাই আবার নতুন কিষেণজীর আবির্ভাব হতেই পারে। তাই রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্রশাসনিক স্তরে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তবে পূর্বতন বাম সরকারের মতো দমন-পীড়নের নীতি ত্যাগ করা দরকার। মনে রাখা দরকার যে জঙ্গলমহলের সবাই কিন্তু মাওবাদী নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীর মানুষ সেখানে আছেন। তাই সুবিচার, উন্নয়ন, জনকল্যাণ সর্বোপরি সেবার মানসিকতা নিয়ে আলোচনার পথকে সুগম করা যেতে পারে। অবশ্যই তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু তা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। দীর্ঘদিন ধরে দুঃখ, দুর্দশা, বঞ্চনা, অবিচারের শিকার হওয়ার ফলেই যে মাওবাদীদের উত্থান তা অস্বীকার করা যায় না। অন্যথায় সংঘর্ষের পথ আরও প্রসারিত হলেও বলার কিছু থাকবে না।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

রেজ্জাকের 'নয়া জমানা'

গত ১৬ নভেম্বর ২০১১ মুসলিমদের (৭৪তম সংগঠন) 'নয়া জমানার' কনভেনশন হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রেজ্জাক, ইমানুল হক, আব্দুল গনি, আনিসুর রহমানসহ সিপিএমের মুসলমান নেতারা। তাঁরা মুসলমানদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য ১০ দফা দাবি পেশ করেন। প্রথম এবং প্রধান দাবি ১৯৭১ সালের পর যে সব মুসলমান বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। আনিসুর বলেন, শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থেই জাতপাতের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই 'নয়া জমানা'র মতো সংগঠনের দরকার।

উত্তর প্রদেশকে চার ভাগ করার প্রস্তাব মায়াবতীর। উত্তরপ্রদেশকে ১। পূর্বাঞ্চল ২। বুন্দেলখণ্ড ৩। অবধ প্রদেশ এবং ৪। পশ্চিম প্রদেশ— এই চারটি রাজ্য করা হবে। গত ১৬ জুলাই ২০০৬ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মুলায়মমন্ত্রিসভার সদস্য নগরোন্নয়ন মন্ত্রী আজম খান দাবি করেছে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ক্ষমতায় থাকলে এতদিন একটা মুসলিম রাজ্য হয়ে যেতো। মুসলমানরা এখনও সেই দাবী করে চলেছে। মায়াবতী তার মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক মজবুত করতে পশ্চিমপ্রদেশ নামে একটি মুসলমান প্রদেশ করতে চলেছে। এটা হলে পশ্চিম প্রদেশ নামক রাজ্যটি কার্যত মুসলমান রাষ্ট্রই হয়ে যাবে এবং সেখানকার হিন্দুদের অবস্থা কাশ্মীরের হিন্দুদের মতোই হবে। আর এই প্রবণতা বজায় থাকলে ভারত আবার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সরকারের উচিত আর কাল বিলম্ব না করে একের অধিক বিবাহ রদ এবং কঠোর ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা। দুইয়ের অধিক সন্তান দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। না হলে খণ্ডিত ভারত আবার মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র হবে।

—অম্বিকা প্রসাদ পাল, ঘোলাবাজার, কলকাতা-১১১

মানবাধিকারের নামে ধান্দাবাজি

গত ২৪ নভেম্বর মাওবাদী নেতা কিষেণজী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হলে, কিছু মানবতাবাদী নেতা ও ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতার হৃদয়ে কিষাণজীর জন্য বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা প্রবাহিত হচ্ছে। তারা রিলে অনশন, মিছিল, ডেপুটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসরে নেমে পড়েছে।

তাদের নিকট আমার প্রশ্ন, গত তিন দশক ধরে কিষেণজী যখন পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য সাধারণ মানুষ, রেলযাত্রী, পুলিশকর্মী, রাজনৈতিক দলের কর্মীকে নিঃসংশয় বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করে অসংখ্য যুবতীকে বিধবা করেছে, নিরীহ শিশুদের-কে পিতৃহারা করেছে, বৃদ্ধদেরকে তাদের প্রাণাধিক পুত্রহারা করেছে তখন এই মানবতাবাদীদেরকে টুঁ শব্দ করতেও দেখা যায়নি। আসলে এই হত্যার দায় যৌথবাহিনীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কিষেণজীকে 'মহান দেশপ্রেমিক' সাজানোর প্রয়াস নিয়েছে তারা।

সবকিছুরই একটা শেষ আছে, মানবাধিকারের নামে ধান্দাবাজি দিনও একদিন শেষ হবে। জনসাধারণের নিকট একদিন এদের মুখোশ খুলে পড়বে। আর পুলিশ কর্তাদের নিকট আবেদন মাওবাদী এলাকায় অপারেশনে যাওয়ার সময় এই ধান্দাবাজ মানবাধিকার কর্মীদেরকে অনুরোধ করবেন তাঁরা যেন আপনাদের অপারেশনে সঙ্গ দেন, তখনই দেখা যাবে কতজন এগিয়ে আসে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সঙ্গী হতে!

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

হিন্দু সভ্যতা

১১/৯-এ ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী, আমেরিকার একচ্ছত্র ক্ষমতার দম্ভের প্রতীক পেন্টাগণ ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আঘাতের উত্তর পর্বেই বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইসলামি সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর পাকিস্তান, যা ভারত বারংবার আমেরিকাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ওসামা বিন লাদেনের নিধনের পর ও তার পূর্বে পরমাণু প্রযুক্তির চোরাই বাজার তৈরীর পর থেকেই পাকিস্তানের ভূমিকা তার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর উপর আক্রমণ ও পাকিস্তানের পরমাণু ভাণ্ডারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বিশ্ববাসীও চিন্তিত। ফলে দুই পুরাতন বন্ধুর মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে।

—শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

ভারতে প্রতিদিন চারজন কৃষক আত্মঘাতী হচ্ছেন

অসীম নাথ

'ভারত কৃষিপ্রধান দেশ'— এটা স্কুলের নিচু ক্লাসের ছেলেও জানে। স্কুলের খাতায় সে রচনাও লেখে কৃষককে সমাজবন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে। এপর্যন্ত ঠিক আছে। কৃষিপ্রধান দেশের কৃষি উৎপাদকদের হাল কীরকম তা জানার কথা নয় স্কুল ছাত্রদের। কিন্তু একটু সচেতন নাগরিকও কি খবর রাখেন কৃষকদের জীবন এখন কোন সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে? সাধারণ কৃষকরা হতাশ হয়ে পড়ছেন বিভিন্ন কারণে। উন্নত কৃষির আশীর্বাদ এদেশে এসেছে দু'ভাবে। কৃষিবিজ্ঞানীরা চাষবাসের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার বীজ নিষ্ঠার সঙ্গে রোপণ করে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁদের দেখানো পথে এগিয়েছেন কৃষকরা। জমি তাঁদের যত্নে নতুন রূপ নিয়েছে। এক সময় দেশ চরম খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, বিদেশ থেকে খয়রাতি গম এনে কোনওরকমে ব্যাপক অনাহার থেকে রক্ষা পেয়েছিল অথচ আজ দেশের অনেক কৃষক বলতে পারেন। গোলায় গোলায় ধান, গলায় গলায় গান।' কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটাকে এক ছকে ফেলে বিচার করা যাবে না। কৃষকের নানান স্তর আছে। অতি সম্পন্ন, সম্পন্ন, সচ্ছল চাষী যেমন আছে তেমনি রয়েছে সামান্য ভূমিখণ্ডের মালিক, ভাগচাষী, ভূমিহীন কৃষক। এছাড়া আছে ক্ষেতমজুর। প্রকৃত চাষী যাঁরা, চাষবাস যাঁদের জীবিকা তাঁরা কিন্তু সহজে কৃষিকর্ম ছাড়তে রাজি নন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, অনেকে চাষবাসে আগ্রহী নয়। গ্রামাঞ্চলে মাঠে কাজ করার লোকজন কম। অন্য কোনও পেশার সঙ্গে যুক্ত হলে বেশি পারিশ্রমিক মিলবে। যাঁরা চাষবাস করেন তাঁরা আরেকটি ব্যাপারও লক্ষ্য করেছেন, চাষের খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। যেসব কৃষকের চাষবাস ছাড়া জীবিকানির্বাহের আর কোনও উপায় নেই তাঁরা অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি। ভূমি তো লক্ষ্মী। তাকে প্রণাম করে চাষ শুরু করতে হবে। চাষের খরচ ফি বছর বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কৃষক চুপচাপ থাকতে পারেন না। তাঁকে জমি চষতে হয়, বীজ বপন করতে হয়। খরচ সামলানোর জন্যে জোগাড় করতে হয় টাকা। সহজ সুদে কৃষিঋণ পাবার অধিকারী কৃষক নানাভাবে বঞ্চিত হন। চড়া সুদে টাকা ধার করা ছাড়া তাঁর উপায় থাকে না। মাঠে উদয়াস্ত খাটার পর ফসল যে ঠিকমতো ফলবে তার কোনও নিশ্চয়তাই নেই। অতিবর্ষণ, অনাবৃষ্টি অর্থাৎ ঝরা এবং খরা রীতিমতো সমস্যা। পাশাপাশি থাকে কীটপতঙ্গের আক্রমণ। তাছাড়া চুরির ভয়। এককথায় চাষবাসের পুরো মরসুম উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটে চাষীর। বীজ কেনা থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত ধারাবাহিক কাজের মধ্যে দিয়ে এগোবার সময় কৃষক ফুরসৎ পান না অন্যদিকে তাকাবার। যখন তাকান, চাষের খতিয়ান নিয়ে বসেন তখন চোখের সামনে স্পষ্ট হয় সরল সত্যটা— কত ধানে কত চাল! এর ফলে চাষীর জীবনে হাজির হয় সংকটের অস্তিত্বের ভয়ঙ্কর রূপ। সেই চাপ সকলের পক্ষে ধৈর্যের সঙ্গে সামলানো সম্ভব হয় না। দুঃখ কষ্টের সঙ্গে ধারাবাহিক লাঞ্ছনা অপমানও জোটে। কোনও কোনও চাষী মুক্তির সহজ পদ্ধতি বেছে নেন— আত্মহত্যা। কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা হয়, চাষের খরচ বাড়া আর ঋণের পাহাড় গড়ে ওঠার অর্থ কোনওদিকে আর ভরসা নেই। মুক্তির পথ বেছে নিয়ে বেঁচে যেতে চান আত্মহত্যার মাধ্যমে।

শুধু এদেশে নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সাধারণ কৃষকের অবস্থা বেশ করুণ।

জানা যাচ্ছে প্রতি আট ঘণ্টায় একজন কৃষক আত্মঘাতী হচ্ছেন। নিউইয়র্ক ইউভার্সিটি স্কুল অফ ল'-এর রিপোর্ট থেকে এসব তথ্য জানা যাচ্ছে। এও জানা গেছে অনেক কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা নথিভুক্ত হচ্ছে না।

মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলায় সম্প্রতি তিনটি আত্মহননের ঘটনার কথা কি প্রচারের আলোয় এসেছে? গত অক্টোবর মাসে ফসল তোলার আগে চারপাশে যখন উৎসবের মেজাজ তখন দু'জন কৃষক নিজেদের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন কেন? আরেকজন আত্মহত্যা করলেন রাজ্যের চাষবাসে উন্নত অঞ্চলের এক চাষী। সেখানেও প্রশ্ন কেন এভাবে আত্মনিধন?

সয়াবিনের চাষ ভালো হয়নি— এটা দেখে মন ভেঙে গিয়েছিল চাষীদের। কেউ কেউ সামলেছেন, কয়েকজন চরম পথ নিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেক সময় সংক্রামক ব্যাধির মতো দেখা দেয়। কৃষকরা দিশেহারা হয়ে সেই পথ বেছে নিচ্ছিলেন। নর্মদা নদীর আশীর্বাদ পাওয়া মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের চাষীরাও ওইভাবে আত্মঘাতী হচ্ছেন। ৩২ বছরের কমল গৌড়া বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ নিজের ১৭ একর জমিতে মাত্র ১৫ কুইন্টাল সয়াবিন উৎপন্ন হয়েছে। একর পিছু এক কুইন্টালও নয়। সরকারি ঋণ ছিল ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ ২,৪৫,০০০ টাকা। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে নিয়েছিলেন ৩৫ হাজার। বিপুল ঋণের বোঝা সামলাবেন কীভাবে এই দুশ্চিন্তায় শেষ করে দিয়েছেন নিজেকে।

এরপরই ঘটেছে আরেক ঘটনা। একই এলাকার ৬২ বছরের রাজপুত গৌড়া গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। কারণ তিন একর জমিতে অতি সামান্য পরিমাণ সয়াবিন উৎপাদন করতে পেরেছিলেন। চাষের জন্যে ধার করেছিলেন আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে। সরকারি ঋণ নেননি। আত্মহত্যার ঘটনার পর সরকারি লোকজন সাফাই গাইছেন মানসিক অসুস্থতার কারণেই নাকি আত্মনিধন। আত্মীয়-বন্ধুরা সরকারের বক্তব্য আমল দেননি।

চুয়ান্ন বছরের মিশিরলাল বেরা থাকতেন অন্য গ্রামে। চাষের জন্য ধার করেছিলেন ৫০ হাজার টাকা। তাঁর তিন একর জমিতে চাষের কাজ করা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিতে পারেননি। কারণ জমিতে মিলেছে মাত্র দু' কুইন্টাল সয়াবিন। তিনি টাকা জোগাড় করে সমস্যা মেটাবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সংকটমোচন সম্ভব হয়নি। শেষে তিনি জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন।

এই কৃষকরা ছিলেন সম্পন্ন চাষী, ক্ষুদ্র বা মধ্যম স্তরের। এসব এলাকায় সয়াবিনের চাষ বেশি হয়। নষ্ট হয়েছে অতি বর্ষণে। আরও চারজন কৃষকের মৃত্যুর খবর এসেছে। সয়াবিন চাষের অবস্থা বেশ করুণ। এবছর একর পিছু শস্য হচ্ছে ২৯ কিলোগ্রাম থেকে ২ কুইন্টাল। ১৯৯৪ সালে ওই জমিতেই উৎপাদন হয়েছিল হেক্টর পিছু ১৮ কুইন্টাল সয়াবিন। যদি চাষীরা জানতেন এক ধরনের সয়াবিনের চাষ তিন-চার বছরের বেশি করা যায় না— তাহলে হয়তো তাঁরা চাষের আগে ভাবতেন।

খোলাবাজারের নীতি ভারত সরকার মেনেছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ১৯৯৫ সাল থেকে একথা বলছে। ফলে বিদেশ থেকে কর কমিয়ে বিদেশি কৃষিদ্রব্য ঢুকবে এদেশের বাজারে। খাওয়ার তেল বিদেশ থেকে কম পয়সায় এলে এদেশের চাষীরা সংকটের মুখোমুখি হবেন। এই ভাবনাও তাঁদের বিচলিত করেছে।

বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, প্রয়োজন উন্নত কৃষির জন্যে। দিনে দিনে চাষের খরচ বাড়ে। সয়াবিন চাষে বিদেশিরা প্রচুল লাভ করছে। মার খাচ্ছে এদেশের কৃষকরা ভয়ঙ্করভাবে। যা তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো একটা ভীতিপ্রদ তথ্য তুলে ধরেছে। শুধু মধ্যপ্রদেশে ২০০৯ সালে ৮,২৯৮ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। এর থেকে দেখা যায় এদেশে প্রতিদিন গড়ে চারজন করে কৃষক আত্মঘাতী হচ্ছেন। এখবর এখনও কি চোখের আড়ালেই থাকবে— এমন প্রশ্ন অনেকেই করছেন।

(উৎস : দি পাইওনীয়ার)

যীশু কি বুদ্ধদেবের অনুগামী ছিলেন?

অম্লানকুসুম ঘোষ

ইতিহাস এক চির-রহস্যময় প্রহেলিকা, রহস্যের হাজারো পর্দার আড়ালে আসল সত্য লুকিয়ে আছে। কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রহস্যের এক-একটি পর্দা উন্মোচিত হয় আর জগৎবাসী বিস্ময়ে বিমোহিত হন। সেরকমই রহস্যের বেশ কয়েকটি পর্দা আবৃত করে রেখেছে যীশুর জীবনের বেশ কিছুটা অংশকে। যীশুর জীবনের সেই অংশের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

দেখা যাক যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বাইবেল কি বলছে। বাইবেল অনুযায়ী দুপুর বারোটায় যীশুকে অন্য দুজন অপরাধীর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। বিকেল ৩টেয় তাঁর মৃত্যু হয়। সঙ্গী অন্য দুই অপরাধী তখনও বেঁচে ছিলেন। তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে পাইলেট তাদের পা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এসময় যোসেফ নামক যীশুর এক শিষ্য যীশুর মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্য পাইলেটের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন। যীশুর আরেক শিষ্য নিকোডেমাস যোসেফের সঙ্গে ছিলেন। নিকোডেমাস মস্তকি আর অ্যালোভেরা এই দুই ভেষজে তৈরি একশো পাউন্ড ওজনের তৈলাক্ত মিশ্রণ নিয়ে এসেছিলেন। যীশুর মৃতদেহ তাঁরা এমন এক জায়গায় কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে গেলেন যেখানে অন্য কাউকে কবর দেওয়া হোত না। (বাইবেল লুক ২৩)

এবার উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। মাত্র তিন ঘণ্টায় যীশুর মৃত্যু হয়েছে শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন রোমান শাসক পন্টিয়াস পাইলেট। যীশুর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ অন্য দু'জন তখনও মারা যাননি। অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর মাত্র তিন ঘণ্টায় সাধারণত কেউ মারা যেতেন না। এবং যীশু যে মারা গিয়েছিলেন তার একমাত্র প্রমাণ সৈনিক লঙ্গিনাস। তিনি পরে বিশপ গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি মনে মনে যীশুর অনুগামী ছিলেন। তাই মিথ্যাচারণের দ্বারা যীশুর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ইহুদীদের কবর দেওয়ার সময় মৃতদেহ জল দিয়ে ধুয়ে কবর দেওয়া হয়, কোনও তৈলাক্ত প্রলেপ দেওয়া হয় না। বরং সমকালীন চিকিৎসা-গ্রন্থাদি থেকে জানা যায়, নিকোডেমাস যে ভেষজদ্বয় নিয়ে এসেছিলেন সে দুটি ক্ষত নিরাময়ের ওষুধ হিসেবে কাজে লাগত। আবার যোসেফ ও নিকোডেমাস যীশুর দেহ এমন এক জায়গায় নিয়ে গেয়েছিলেন যেখানে কাউকে কবর দেওয়া হয় না। মনে প্রশ্ন জাগে তাঁরা কি যীশুকে কবর দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, না লোকচক্ষুর অন্তরালে রাজরোষে পতিত যীশুকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন? ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাস গ্রন্থ এবং যীশুর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ফ্লাভিয়াস জোসেফাসের নানা বই থেকে জানা যায় যে ক্রুশবিদ্ধ করার পরেও কোনও মানুষকে নামিয়ে এনে উপযুক্ত শুশ্রূষা করলে তাঁকে বাঁচানো যেত। অতএব ক্রুশবিদ্ধ যীশুর চিকিৎসা অস্বাভাবিক ছিল না।

আর রেসারেকশন (Resurrection) শব্দটা? প্রাচীন হিব্রু ভাষায় এই শব্দটির অর্থ ছিল রোগ থেকে সেরে ওঠা।

বাইবেলের লুক অংশের ২৪ নম্বর অধ্যায় বলা আছে যীশুর রেসারেকশনের পরে একদল কৃষকের সঙ্গে পরিচয় গোপন করে জেরুজালেম থেকে তিনি বেশ অনেকদূর গেয়েছিলেন। পরে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় তাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় ক্ষত নিরাময়ের পর যীশু ছদ্ম পরিচয়ে পদব্রজে শত্রু অধ্যুষিত অঞ্চল ছেড়ে দূরে চলে গেয়েছিলেন।

কিন্তু যীশু সুস্থ হয়ে গেলেন কোথায়? ইতিহাসের বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ধরাবাহিকভাবে সাজিয়ে নিলে চিত্রটা একটু পরিষ্কার হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ তাঁর তিব্বত সফরের কথা লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন সেখানে হেমিস গুম্ফার প্রধান তাঁকে প্রাচীন এক তিব্বতী পুঁথি দেখিয়েছেন। সেই পুঁথিতে লেখা আছে ইজরায়েলে জন্মানো ঈশা ছোটবেলায় বণিকদের সঙ্গে কাশ্মীরে আসেন, সেখানে বৌদ্ধ দর্শন এবং বেদান্ত অধ্যয়ন করেন ও ইজরায়েলে ফিরে যান এবং সেখানে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। সেখানে যখন তাঁকে হত্যার চক্রান্ত হয় তখন তিনি পালিয়ে কাশ্মীরে চলে আসেন।

ভারতের নাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তাদের প্রথম ধর্মগুরু ইশানাথ ১৪ বছর বয়সে প্রথম ভারতে এসেছিলেন, পরে তিনি দেশে ফিরে যান, সেখানে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, তিনি যোগবলে বেঁচে ভারতে ফিরে আসেন ও পরে এখানে ধর্মপ্রচার করেন।

কাশ্মীরে রোজা বাল মসজিদে ইয়ুজ আসফ নামের এক সাধুর কবর আছে। এই কবরটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মতো উত্তর-দক্ষিণে না হয়ে ইহুদীদের মতো পূর্ব-পশ্চিমে রয়েছে। মসজিদে তাঁর দু'পায়ের ছাপও রয়েছে। দুই পায়েই ক্রুশের ক্ষতচিহ্ন। কাশ্মীর ইরান ও আফগানিস্থানের বহু জায়গায় প্রচলিত কিংবদন্তী আছে যে এই ইয়ুজ আসফ-ই যীশু।

ইতিহাসের এই খণ্ডাংশগুলিকে একত্রিত করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে যীশু রেসারেকশনের-এর পরে ভারতে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু যীশু ভারতে চলে এলেন কেন? কারণ যীশুর জীবনের প্রথমাংশের বেশ কিছু অধ্যায় কেটেছে ভারতবর্ষে। বাইবেলের যীশুকে দেখা যায় বারো বছর বয়সে জেরুজালেমের মন্দিরে, তার পরেই দেখা যায় তিরিশ বছরের যীশুকে। মাঝখানের সময়ে উনি কোথায় ছিলেন তার উল্লেখ বাইবেলে নেই। তিব্বতী গুম্ফার পুঁথি ও নাথ সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিশ্বাস বলে সে সময় তিনি ভারতে ছিলেন। কিন্তু এছাড়াও যীশুর প্রথম জীবনে ভারতে আগমনের অনেক প্রমাণ আছে। তিরিশ বছর বয়সে জেরুজালেমে ফিরে যীশু ইহুদীদের এসেন ধর্মগোষ্ঠীর সদস্য হয়েছিলেন এবং এসেন গোষ্ঠীতে নতুন কিছু মতবাদ প্রচলন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হলো মানবজীবনের কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য আটটি বিশিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলা, যা প্রকৃতপক্ষে হীনযান বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুরূপ।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদানের সময় ঘরে একটি দীপ জ্বলত এবং গুরু শিষ্যের মাথায় মঠে রক্ষিত পবিত্র জল ছিটিয়ে দিতেন। একই প্রথা যীশু প্রবর্তিত খৃষ্টধর্মে দেখা যায়। এই প্রথা কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত নেই।

হীনযান বৌদ্ধধর্মে প্রার্থনার মূল স্তোত্র হলো বুদ্ধের কাছে যাব, সঙ্ঘের কাছে যাব, ধর্মের কাছে যাব। খৃষ্টধর্মের প্রার্থনাও অনুরূপ। খৃষ্টের কাছে যাব, চার্চের কাছে যাব, ধর্মের কাছে যাব।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর ও প্রাণীকুলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। স্রষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বর আর সৃষ্টি অর্থাৎ জীবজগৎ। আর সমগ্র জীবজগতের মুক্তি ঘটাবেন বুদ্ধ স্বয়ং। আর খৃষ্টধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ীও ঈশ্বর ও জীবজগৎ দু'ভাগে বিভক্ত— স্রষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বর এবং সৃষ্টি অর্থাৎ জীবজগৎ। আর সমগ্র জীবজগতের মুক্তি ঘটাবেন খৃষ্ট স্বয়ং।

অতএব দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। যীশু প্রথম জীবনে ভারতে এসে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে এই সাদৃশ্য দেখা যেত না। এছাড়াও তৎকালীন হিংসাজর্জর মধ্যপ্রাচ্যে যীশু প্রবর্তন করেছিলেন এক অহিংসানির্ভর ধর্মের। যার প্রেরণা তৎকালীন বিশ্বে তিনি একমাত্র অহিংস বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও থেকে পেতে পারেন না।

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন ''শুনতে হয়তো ভালো লাগবে না, কিন্তু জেনে রেখো এই যে খৃষ্টনীতি, এই ক্যাথলিক চার্চ সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া।'' (১৮৯৪ খৃস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি ডেট্রয়েটে দেওয়া 'হিন্দু ও খৃস্টান' বক্তৃতার অংশ)

আত্মবিশ্বাসের শক্ত জমি ও একটি ছেলে

কয়েকদিন ধরেই ক্লাসটিচার লক্ষ্য করছিলেন ব্যাপারটা। অভিজাত স্কুলে অনেকরকমভাবে ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য করার রীতি আছে। সবকিছুর মধ্যে শৃঙ্খলা চাই। ওই শৃঙ্খলা ব্যাপারটা ছাড়া পড়াশোনার কাজ ঠিকভাবে এগোয় না— এটা থেকেই সমস্ত কাজ। শৃঙ্খলাপরায়ণ ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনের ভিতটা ঠিকভাবে তৈরি করতে পারে। সব প্রায় ঠিকঠাক চলে বলে একটু তালভঙ্গ বা বেচাল হলেই তা নজরে পড়ে যায়। তখনই কড়া চোখে তাকানো শুরু হয়। কেন এমন তালভঙ্গ তা জানবার চেষ্টা থাকে না। কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়, কেন কেন কেন? আমরা যেমন বলবো যেভাবে বলবো সেভাবে চলতে হবে। নিয়মভঙ্গ একেবারেই চলবে না।

দেবজিৎ ক্লাস নাইনের ছাত্র। ওদের ক্লাস টিচার পিনাকী মিত্র অঙ্কের শিক্ষক। স্কুলে প্রতিদিন প্রথম ক্লাস অঙ্কের হওয়াতে কিছু ছাত্র উৎসাহ পেত, কিছু ছাত্রের ভালো লাগত না। তবে পি এম স্যারের অঙ্ক শেখানোর পদ্ধতি অন্যরকম। ফার্স্ট বেঞ্চের ছেলেদের দিকে যেমন তাঁর নজর, তেমনি লাস্ট বেঞ্চের ছেলেদের দিকেও। অঙ্ক ভালো লাগে না যাদের তারাও কিছুটা আকর্ষণ খুঁজে পায়। যারা একশোয় একশো নম্বর পায়, অঙ্ক যারা খুব ভালোবাসে, তাদের যেমন সাহায্য করেন পি এম, তেমনি অন্যদেরও। দেবজিৎ অঙ্কে খুব ভালো। রোগা, সুন্দর-মুখ ছেলেটা মাঝে মাঝে জানতে চায় কোনও কোনও প্রশ্ন। পিনাকী উত্তর দেন। জানা না থাকলে বাড়িতে বা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে জানান। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছিলেন দেবজিৎ একটু অন্যমনস্ক। অঙ্ক করছে ক্লাসে ঠিকই, কিন্তু উৎসাহ যেন একটু কম। মুখটা ম্লান, বোধহয় রোগাও হয়ে গেছে। পিনাকী এসব কিন্তু খুব একটা মনোযোগে লক্ষ্য করেননি। তাঁর নজরে পড়ল একটা ব্যাপারই প্রথমে। অন্য ছেলেরা হাঁটা চলা করছে চামড়ার বুটের আওয়াজ তুলে। কালো ঝকঝকে জুতো। নামী কোম্পানির। দেবজিৎ হাঁটছে হালকা পায়ে। তার পায়ে চটি। তাও খুব কম দামের। অভিজাত স্কুলের সঙ্গে মানানসই নয়। পিনাকী স্যার ক'দিন লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, 'শোন দেবজিৎ, সোমবার যদি তুমি সু না পরে আসো তাহলে ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারে থাকবে না।'

সপ্তাহের শুরু সোমবার। পিনাকী স্যার ক্লাসে একটুও ফাঁকি দেন না। সারাটা সময় ব্যস্ত থাকেন। ক্লাসে দেবজিতের খাতা দেখে দিলেন। একবার দেখে নিলেন ছেলেটির পা। আজও চটি পায়ে। একটু রেগে গেলেন। স্থির করলেন, জানাতে হবে রেক্টরকে। তিনি প্রতিদিন বিকেলে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে জানতে চান ছাত্রদের সম্বন্ধে। পিনাকী জানালেন রেক্টর সত্যেন গুহরায়কে 'আমার ক্লাসের দেবজিৎ মুখোপাধ্যায় স্কুলের ভালো ছাত্রদের একজন। তার ব্যবহার ভালো, পড়াশোনায় ভালো। কিন্তু কিছুদিন ধরে তার একটা ব্যাপার মোটেই ভালো লাগছে না। আমার মনে হয় ছেলেটি স্কুলের ইউনিফর্ম কোড মানছে না ইচ্ছে করেই। আপনি কোনও ব্যবস্থা না নিলে অন্য ছাত্ররাও ওইরকম করতে পারে।' সত্যেন গুহরায় সব শুনে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি ছেলেটির সঙ্গে আজই কথা বলবো।'

দেবজিৎ কোনওদিন রেক্টরের ঘরে ঢোকেনি। ভয়ে ভয়ে ঢুকল। বড় ঘর। ঘরে অনেক বই চারপাশের আলমারিতে। বিরাট টেবিলের একদিকে বসে আছেন প্রবীণ মানুষটি। তিনি মুখ তুলে বললেন, 'তোমার নাম দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়?' দেবজিৎ জানাল, 'হ্যাঁ স্যার।' রেক্টর বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। আমি জানি তুমি পড়াশোনায় খুব ভালো। সব শিক্ষকই তোমার সম্বন্ধে ভালো কথা বলেন। কিন্তু একজন বললেন তুমি কিছুদিন ধরে স্কুলের নিয়ম মানছো না। তোমাকে স্কুলের ইউনিফর্ম-নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়েছিল। তুমি সু না পরে চটি পরে আসছিলে। বলা সত্ত্বেও কথা শোননি। আমার কাছে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। আমার মনে হয়, কোনও একটা ব্যাপার ঘটেছে। তুমি আমাকে একজন বন্ধু হিসেবে বলো। কেউ জানবে না বলো।' একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দেবজিৎ। রেক্টর বললেন, 'ভয় নেই। তুমি বলো।' দেবজিৎ বলল, 'স্যার আমার জুতো নেই। যেটা ছিল সেটা ছিঁড়ে গেছে। আমার বাবা যেখানে কাজ করতেন সেই কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।' আর কিছু বলতে পারল না দেবজিৎ। সত্যেন গুহরায় বহু ছেলেকে দেখেছেন। লক্ষ্য করলেন, মাথা নিচু করে দেবজিৎ কাঁদছে। রেক্টর উঠে এসে বললেন পিঠে হাত দিয়ে, 'যাও তুমি ক্লাসে যাও। মনে জোর রাখো মাই বয়। পড়তে হবে।' বেল বাজিয়ে বংশীকে ডাকলেন। বললেন, 'একে ক্লাসে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

এরপর ইন্টারকমে ডাকলেন হেডক্লার্ক নিখিলেশ ঘোষকে। বললেন, 'ক্লাস সেভেনের দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে জুতোর দোকানে যাবেন। তাকে আমাদের ইউনিফর্মের জুতো কিনে দেবেন।' রেক্টর নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন।

দেবজিৎ পরের দিন নতুন জুতো পরে স্কুলে গেলো। শুধু দুজন ব্যাপারটা জানলেন, নিখিলেশ ঘোষ আর ক্লাস টিচার পিনাকী মিত্র। দেবজিৎ লক্ষ্য করল পি এম খুব খুশি তার উপর। বললেন, 'যখনই দরকার হবে পড়ার ব্যাপারে আমার কাছে চলে আসবে।' পি এম সকলকে ওইরকম বলেন না। রেক্টরের নির্দেশে কয়েকজন শিক্ষক দেবজিতের পড়াশোনায় সাহায্য করলেন। তার বাবা অনেক কষ্টের মধ্যে ছেলেকে পড়াশোনায় ক্রমাগত উৎসাহ দিয়েছেন। রেক্টরের নির্দেশে স্কুলে পুরোপুরি ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পেয়েছিল দেবজিৎ। বই খাতার জোগানও ছিল রেক্টরের নির্দেশে। হায়ার সেকেন্ডারিতে দারুণ রেজাল্ট করল সে।

স্কলারশিপ পেলো দেবজিৎ। স্কুলের গর্ব সে। রেক্টরকে প্রণাম করতে তিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলছিলেন, 'এগিয়ে যেতে হবে। অনেক পথ পেরোতে হবে।'

বেশ কয়েক বছর পরের কথা। দেবজিৎ এখন বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করছে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৃত্তি নিয়ে বিদেশ গেছে। ছাত্র হিসেবে তার সুনাম সেদেশেও। পাশাপাশি সে বাবার পাশে দাঁড়িয়েছে কলেজে পড়ার সময় থেকেই। বাবাও বলেছেন, 'তুমি এগিয়ে যাও।' স্কুলের স্যার পিনাকী মিত্র তো এখনও বলেন, তাঁর সেরা ছাত্রদের অন্যতম 'দেবজিৎ।' মনে পড়ে তিনিই অভিযোগ করেছিলেন রেক্টরের কাছে। রেক্টর পরে বলেছিলেন, 'পিনাকীবাবু, শিক্ষক আপনি। ছেলেদের সমস্যাও বুঝতে হবে আপনাকে। তাদের মনকে চিনতে না পারলে কাজ আদায় করবেন কীভাবে? সব কাজে ভালোলাগা ভালোবাসা চাই।'

রেক্টরের কথায় মনের চোখ খুলে গিয়েছিল পিনাকী মিত্রের। দেবজিৎ নতুন ভাবে জেগে উঠেছিল স্কুলের সর্বোচ্চ আসনে বসে থাকা মানুষটির কাছে উৎসাহ পেয়ে। একটা সামান্য ঘটনা আর কাজ সেদিনের অসহায় ছেলেটিকে আত্মবিশ্বাসের শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

বছর শেষে ফিরে দেখা
অভূতপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর অঙ্গনাদের

অঙ্গনা

মিতা রায়

প্রায় শেষ হয়ে এল একটা বছর। আর কিছুদিন পরই শুরু হবে নতুন বছর। শুভ হোক, মঙ্গলময় হোক, সকলের জীবন আনন্দে কাটুক— এই কামনা করতে গিয়েই অনেক সময়ে মনে জাগে ফেলে আসা বছরের আলো-আঁধারির কথা। সেই সূত্রেই ঝলসে ওঠে আলো চোখে মুখে— ফেলে আসা বছরে দেশে-বিদেশে মহিলাদের বিশেষ কিছু কাজ, ঘটনা, যা তাঁদের লাইম লাইট-এ আনতে সাহায্য করেছে। সেই সঙ্গে নারী হয়ে গর্ববোধ হয় যে, সাম্প্রতিককালে নারী এতটাই প্রতিবাদী, অসমসাহসী স্বাবলম্বী ও শুভ লক্ষণযুক্তা হয়ে উঠেছেন। বছরব্যাপী নারীজগতে ঘটেছে অনেক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, যা স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি ঘটনা পাঠকদের জন্য রইল।

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রথম মহিলা জওয়ান শান্তি টিগ্গা।

প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে প্রথম মহিলা জওয়ানের প্রতি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম মহিলা জওয়ান আমাদের বাংলার উত্তরবঙ্গের গ্রামের কন্যা— যাঁর পারিপার্শ্বিক ছিল এমনই যেখানে জীবন মানে বিয়ে করে হাতা-খুন্তি ধরা, সেখানে হাতা-খুন্তির পরিবর্তে দেশের জন্য হাতে রাইফেল ধরে আত্মবলিদানে প্রস্তুত শান্তি টিগ্গা— এক নতুন নজির গড়লেন। তিনি ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করেছেন, প্রমাণ করলেন যে মেয়েরা পুরুষেরই সমকক্ষ বা আরও বেশি কিছু। শান্তি টিগ্গা অত্যন্ত গর্বিত এই ভেবে যে ১৯৯ জন পুরুষকে টপকে ট্রেনিং-এর পাঁচটি বিভাগের মধ্যেই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং সেরার পদক পান। তাঁর কথায় : ২০১০-এ ইন্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল আর্মির অধীনে ট্রেনিং নেওয়ার সময়ে আমার সঙ্গে ১৯৯ জন পুরুষ ছিলেন। তবে সকলকে টপকে ট্রেনিং-এর পাঁচটি বিভাগেই সেরার পদক পাই। ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতিও আমাকে পুরস্কৃত করেন। সবচেয়ে কঠিন ছিল দিল্লীতে একটি কম্যান্ডো ট্রেনিং। অনেক ছেলে না পেরে চলে গিয়েছিল।— তিনি বর্তমানে ভারতীয় রেলে চাকুরিরতা। তাঁর উত্তরোত্তর সামান্য কামনা করি।

আন্তজাতিক শান্তি পুরস্কারে ভূষিতা অসমসাহসী মালালা ইউসুফ জাই।

প্রবাসে দিল্লীতে হয়তো কেউ দেখেছেন, হয়তো বা সওয়ারিও হয়েছেন সেই অটোতে, যার চালক মহিলা, পরনে সাদা শার্টপ্যান্ট, চুল ছোট করে ছাঁটা। উজ্জ্বল চেহারায় প্রতিভাত ব্যক্তিত্ব— বয়স নির্ধারণ করা কঠিন, তবে তেত্রিশ বছর। দিল্লীর পথে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অটোচালিকার কাজ করে চলেন সুনীতা। হঠাৎ সব ছেড়ে অটোচালক হওয়ার স্বপ্ন কেন— উত্তরে ফিরে গেলেন আজ থেকে ন' বছর আগের সেই দিনে। পথ চলতি রক্তাক্ত আহত এক ব্যক্তিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেও কেউ যখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে না, তখন মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত সুনীতা যে অটোয় ছিলেন তাতে করে আহত ব্যক্তিকে নিয়ে যান হাসপাতালে। তখন থেকেই ঠিক করেছিলেন অটোচালনা শিখে নিজেই অটো চালাবেন। রাত-বিরেতে দিল্লীর রাস্তা মহিলাদের পক্ষে নিরাপদ নয়, তাই সুনীতা তাদের অভয়। পুরুষদের তেমন পাত্তা দেন না। সংসার পাতা হয়েছিল, সেখানে পাওনা হয়েছিল অত্যাচার। বিয়ের বছর দুই বাদে কন্যাসন্তান জন্ম নেয়, দু' মাস পৃথিবীর আলো দেখে বিদায় নেয় সে। নিঃসঙ্গ সুনীতার এখন সঙ্গী অটোই।

ভাবা যায় এগারো বছরের কিশোরীর হাতে প্রতিবাদী কলম— যা তাকে এনে ছিল শিশুদের জন্য 'আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার'। হ্যাঁ, অসম্ভবকে সম্ভব করেছে পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকার মালালা ইউসুফ জাই। তার প্রতিবাদ তালিবানদের বিরুদ্ধে, তাদের এলাকায় মেয়েদের স্কুল এবং পছন্দের ভারতীয় টিভি সিরিয়াল নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে। সেই প্রতিবাদই লেখনীর মাধ্যমে সে প্রকাশ করে বিশ্বের কাছে এক বিশিষ্টতা অর্জন করল।

অক্টোবরের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর-এ চমকপ্রদ ঘটনা ভারত এবং ফিলিপাইনসে ঘটে গেল। দুই নবজাতিকা বিশ্বের জনসংখ্যাকে পৌঁছে দিল সাতশো কোটিতে। বিশ্বের সাতশ কোটিতম মানবসন্তান হিসেবে মর্যাদা তো পেলই; এদের আগমনকে শুভেচ্ছা জানাতে সব আয়োজন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এন জি ও সংস্থা প্ল্যান ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ভাগ্যশ্রী ডেঙ্গলে। তিনি বলেছেন— বিশ্বের সাতশ কোটিতম কন্যাসন্তান হওয়াটা একটা শুভ লক্ষণ। বিশেষত ভারতের মতো দেশে। এ দিনটি খুবই আনন্দের দিন। গর্বিত ফিলিপাইনসের ম্যানিলায় নবজাতিকা ড্যানিকার মা তরুণী কামিলা। ভারতের লক্ষ্ণৌ-এর দানাউর গ্রামে জন্মানো নার্গিসের বাবা-মা পেশায় কৃষক অজয় বিনীতা আপ্লুত। অজয় বলেছেন— 'আমরা কন্যাসন্তান আশা করেছিলাম। আরও জানিয়েছেন গ্রামে গ্রামে প্রচার করবেন মেয়েদের যেন অবহেলা না করা হয়। সমাজে তারা দেবী।'

‘যোগক্ষেম’-এর আলোচনা সভা

কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল’ আইন হলে গোটা হিন্দু সমাজই ‘সাম্প্রদায়িক’ হবে

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত রামমাধব। বসে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) নির্মাল্য ভট্টাচার্য, মোহিত রায় ও মহুয়া ধর।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এতদিন পর্যন্ত বিজেপি, আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনকে সাম্প্রদায়িক বলা হোত। ‘‘প্রিভেনশন অফ্ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল ২০১১’’-এর খসড়া আইনে পরিণত হলে সারা হিন্দু সমাজই আইনগত ভাবে ‘সাম্প্রদায়িক’ বলে পরিগণিত হবে।’’ গত ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতায় মহাজাতি সদন (এ্যানেক্স) প্রেক্ষাগৃহে ‘যোগক্ষেম’ আয়োজিত এক আলোচনাসভায় প্রস্তাবিত বিল নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন শ্রীরামমাধব। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন মুখপাত্র এবং বর্তমানে সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য।

শ্রী রামমাধব আরও বলেন, ১৯৪৭-এর জুন মাসে দিল্লীতে প্রায় ১৯ দিন গান্ধীজী জিন্নার কাছে নিয়মিত গিয়ে তাঁকে ভারত ভাগ না করে অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমনকী তিনি জওহরলালকে ‘ম্যানেজ’ করবেন বলে কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না রাজী হননি। জিন্নার বক্তব্য ছিল— ‘স্বাধীন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।’ গান্ধীজীকে জিন্না ‘ক্ষতিকারক’ (মিশচিভিয়াস) আখ্যা দেন। বিল পাশ হলে জিন্নার কথাটাই ‘সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজই সংখ্যালঘুদের উৎপীড়নকারী’— সত্যে পরিণত হবে। কেননা সারা দেশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ওই বিল প্রযোজ্য নয়। ওই বিলের এক নং ধারা অনুযায়ী হিন্দুরা অত্যাচারী আর সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত। হিংসাকে আবার ওই বিলে শারীরিক মানসিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি অপরাধ করলে সেই ব্যক্তি যে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সেই সংগঠনকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। বিলের চার নং ধারা মতে সংখ্যালঘুকে যদি কোনও হিন্দু বাড়িভাড়া দিতে না চান তাহলে তিনি ‘ঘৃণা প্রচারের’ দায়ে অভিযুক্ত হবেন। guilt will be compounded— এক অপরাধের নানান ধরন।

সাধারণভাবে ভারতবর্ষের আইনে অপরাধী প্রমাণ ও আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ দোষী নন, কঠোর আইন পাশ হলে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের পারস্পরিক সম্বন্ধ চিরতরে খতম হয়ে যাবে বলে শ্রীরামমাধব মন্তব্য করেন। প্রস্তাবিত আইনে প্রথমেই অপরাধী বলে ধরে নেওয়া হবে। এমনকী বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগের ব্যাপারেও সবকিছু পরিচালিত হবে সাতজনের কমিটি দ্বারা। যে সাতজনের মধ্যে চারজন অবশ্যই সংখ্যালঘু।

অথচ ১৯৬০ সালে রাজস্থানের এক মামলায় সুপ্রীমকোর্ট রায় দিয়েছিল যে, ‘আইন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রযোজ্য হবে। কোনও তারতম্য হবে না।’ ১৯৮৯-এ তপসিলি জাতি ও জনজাতিদের রক্ষার জন্য আইন পাশ হয়েছে। শ্রীরামমাধবের মতে এই প্রস্তাবিত আইন সস্তা চমক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এরমধ্যেই অনেক পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে, তবে শ্রী মাধব যে মানসিকতা থেকে এই বিলটির উদ্ভব তা ভালোভাবে বোঝার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বিগত ছয় দশকের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী জানান। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি উত্তরাখণ্ড ও উজ্জয়িনীতে যে দাঙ্গা হয়েছে তারও সূত্রপাত মুসলমানরাই করেছে। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্রী রামমাধব জানান, প্রস্তাবিত বিলটি এক মাসের জন্য দিল্লীর ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্সের অফিসে পাঠানো হয়েছিল মূল খসড়া পাশের আগেই।

এদিন সভার অন্য বক্তা ডঃ মোহিত রায় পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, ২০৫০-এর মধ্যে ভারতে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। এটা অঙ্কের হিসাব। সভা পরিচালনা করেন নির্মাল্য ভট্টাচার্য এবং ধন্যবাদ জানান শ্রীমতী মহুয়া ধর।

কুমারসভা পুস্তকালয় ও বড়বাজার লাইব্রেরী আয়োজিত সভায় ‘সাম্প্রদায়িক এবং লক্ষিত হিংসা প্রতিরোধ’ বিষয়ে ভাষণরত ইন্দ্রেশ কুমার। বসে (বাঁ দিক থেকে) যুগলকিশোর জৈথলিয়া, শেষাদ্রিচারী, শার্দুল সিং, বিমল লাঠ ও অশোক গুপ্তা।

চন্দননগরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ধর্মীয় সম্মেলন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অনুমোদিত চন্দননগর হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে গত ৮ থেকে ১০ ডিসেম্বর হিন্দু ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মেলন হয়ে গেল। এই উপলক্ষে রক্তদান শিবির, ধর্মীয় শোভাযাত্রা, হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা, শ্রীশ্রী গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনের ধর্মীয় সম্মেলনে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন চন্দননগরের বিধায়ক অশোক কুমার সাউ এবং চন্দননগর করপোরেশনের মেয়র রাম চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন খলিসানী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নেপঙ্কর হাজরা ও সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য। প্রথম দিনে টালীগঞ্জ প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সঙ্ঘাত্মানন্দজী, পশ্চিমবঙ্গ বৈদিক একাডেমীর সচিব নবকুমার ভট্টাচার্য হিন্দুধর্মের সমন্বয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় দিনে জাতিগঠনে স্বামী প্রণবানন্দের অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডাঃ প্রবীর লাহিড়ী ও বরুণ ঘোষ। দুই দিনেরই ধর্মীয় সম্মেলনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহ সম্পাদক অরুণানন্দজী আশীর্বচন দেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজ। সকলকে ধন্যবাদ জানান চন্দননগর হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক নির্মল কুমার ঘোষ।

নদীয়া জেলায় বিশাল হিন্দু সম্মেলন

''কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, হাজার হাজার নিঃস্বার্থ, দেশভক্ত ও বীর সন্তান চাই''। এই বলে হিন্দু মায়েদের আহ্বান করলেন মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)। গত ২৭, ২৮ ও ২৯ নভেম্বর নদীয়া জেলার ধরমপুর কালীমন্দির মাঠে সীমা জনকল্যাণ সমিতি আয়োজিত এক বিশাল হিন্দু সমাবেশ তিনি এই আহ্বান জানান। তিন দিন ধরে হয় বাউল গান, মেলা, কুইজ, যাত্রা এবং শেষদিন ছিল বিশাল সভা। এই বিরাট সমাবেশে মায়েদের উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩০টি মোটর সাইকেল র‍্যালি করে স্বামিজীকে মন্দির প্রাঙ্গণে আনা হয়, পথের দুইধারে মায়েরা শঙ্খ, উলুধ্বনি ও ফুল সহযোগে মহারাজকে স্বাগত জানান। এই সভায় অন্যান্য বক্তার ভিতর ছিলেন মটুকেশ্বর পাল ও দিলীপ ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অর্জুন বিশ্বাস।

সমাবেশ সমাচার

চাঁদেরহাটে হিন্দু সম্মেলন

গত ২৯ নভেম্বর বিকালে নদীয়া তেহট্টের চাঁদেরহাট গ্রামে সীমা জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বৃন্দাবন বিশ্বাস ও অসিত মণ্ডল-এর পরিচালনায় বিরাট হিন্দু সম্মেলন হয়ে গেল। এই সভায় প্রায় দুই হাজার হিন্দু মা ও বোন উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেও বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ও সমিতির মুর্শিদাবাদ সভাপতি তাপস কুমার বিশ্বাস।

শোক সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা ভারতীর প্রাক্তন সহ সভাপতি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিউ ব্যারাকপুর শাখায় স্বয়ংসেবক সুনীল চক্রবর্তী গত ১০ ডিসেম্বর স্বল্প রোগভোগের পর মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

বছর শেষে ফিরে দেখা

ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রাপ্তি শুধু রঞ্জন সোধী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১১ বছরটা তেমন কিছু দিতে পারল না ভারতবর্ষের ক্রীড়াজগৎকে। বলার মতো সাফল্য বলতে শিখ যুবক রঞ্জন সোধীর বিশ্ব শ্যুটিংয়ে রেকর্ড সহ খেতাব জেতা। ডাবল ট্র্যাপ স্কিট শ্যুটিংয়ে এই মুহূর্তে রঞ্জন বিশ্বসেরা। গত বছর এশিয়াডে সোনা জিতেছিলেন। কমনওয়েলথে রূপো। আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রেকর্ড গড়েও রূপো জিতে যথেষ্ট ভেঙে পড়েছিলেন। এবছর সুদে আসলে পুষিয়ে নিলেন। সামনের বছর লন্ডন অলিম্পিকে তিনি ভারতের সেরা বাজি। রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর এই ইভেন্টে এথেন্সে রূপো পান। এবার তা রঞ্জন সোনায় বদলে ফেলতে পারেন কিনা তার দিকেও তাকিয়ে থাকবেন ১২০ কোটি মানুষ।

রঞ্জন ছাড়াও এবছরটা শ্যুটাররা মোটামুটি গর্ব করার মতো পারফরমেন্স মেলে ধরেছেন। তেজস্বিনী সাওয়ান্ত, গগন নারং সহ অন্যান্য ভারতীয় শ্যুটাররা নিজেদের ছাপিয়ে যেতে না পারলেও মোটামুটি একটা ভারসাম্য ধরে রেখেছেন। আশা করা যায় লন্ডনে এঁরা দক্ষতা ও ক্ষমতার শীর্ষে উঠে দেশকে আরও ২/৩টি পদক এনে দেবেন। এই মুহূর্তে শ্যুটিংয়ে ভারত বিশ্বপর্যায়ে এত বড় শক্তি যে তাই একাধিক পদক না জিতলে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। গত দুটি অলিম্পিকে শ্যুটিংই ভারতের মান রেখেছে। এথেন্সে রাজ্যবর্ধনের রূপোর পর বেজিং গেমসে ইতিহাস সৃষ্টি করে অভিনব বিন্দ্রা ব্যক্তিগত স্তরে প্রথম সোনা নিয়ে আসেন। বেজিংয়ে অবশ্য সবমিলিয়ে ভারত তিনটি পদক পায়। অভিনবের সোনা ছাড়াও বিজেন্দার ও সুশীল কুমার যথাক্রমে বক্সিং ও কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জিতে অলিম্পিকে ভারতীয় ক্রীড়া সংস্কৃতির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

এবছর দু'জনেই কিন্তু নিজেদের মান ও মাত্রার ধারেকাছে ছিলেন না। গত বছর কমনওয়েলথ ও এশিয়াডে দুই বীর সন্তানই অনায়াসলব্ধ বিজয় গরিমায় রাঙিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রীড়াবৃত্তকে। এবছর সুশীল চোট আঘাতে কাবু হয়ে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিটে মাঠে নামেননি। বিজেন্দার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর ব্রোঞ্জ পদকটিও ধরে রাখতে পারেননি। বরঞ্চ মণিপুরী তরুণ সুরঞ্জন সিং অধিক চমক দিয়ে বিশ্ব মিটে তৃতীয় হয়ে যান। সুরঞ্জন, দীনেশ, বিজেন্দার, অখিল, জয়ভগবানকে নিয়ে গড়া ভারতীয় বক্সিং দল লন্ডনে হেভিওয়েট দেশগুলোকে নয়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে' তা নিয়ে কোনও সংশয়ই নেই। প্রশ্ন হলো এঁরা ক'টি পদক দেশকে দিতে সক্ষম হবেন? একই কথা প্রযোজ্য কুস্তির ক্ষেত্রেও। সুশীল বেজিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠে বলেছিলেন এতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তাঁর লক্ষ্য অলিম্পিক সোনা আর তারজন্য লন্ডনে সর্বস্ব নিঙড়ে দেবেন।

লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি অনেক ঢাকঢোল

রঞ্জন সোধী

পিটিয়ে নতুন করে জুটি বেঁধে ছিলেন। বছরের প্রথমার্ধে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠে টেনিস প্রেমীদের অনেক স্বপ্নও দেখিয়েছিলেন। তারপর মিয়ামি (যুক্তরাষ্ট্র) মাস্টার্স এটিপি জিতে টেনিস দুনিয়ার মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। বাঘা বাঘা বিশেষজ্ঞ তাঁদের মধ্যে ১৯৯৯-২০০১-এর ফর্মের ছায়া দেখতেও পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর কোনও গ্রান্ডস্লামেই লি-হেশ জুটি প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। আর লন্ডন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবারও তাঁদের অধরাই থেকে গেল। এর আগে তিনবার তাও রানার্স হয়েছিলেন। এবার বিশ্বসেরা জুটি ব্রায়ান ভাইদের হারিয়ে শেষ চারে উঠে অনামী পোলিশ জুটির কাছে ছিটকে যান। আর তারপরই জানিয়েছেন জুটি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এরপর সার্কিটে বিদেশী কাউকে নিয়ে খেলবেন। তবে ডেভিস কাপ ও লন্ডন অলিম্পিকে একসঙ্গে খেলবেন।

হকিতে এশিয়ান চ্যালেঞ্জার্স জিতে যথারীতি মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ভারতীয় দল। ইদানীং এশিয়স্তরে প্রায় সব টুর্নামেন্টেই জিতছে ভারত। বিশ্ব আসরে গিয়ে সেই দলই খাদের কিনারে চলে যায়। সদ্যসমাপ্ত আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নস চ্যালেঞ্জারের ফাইনালে গিয়ে বেলজিয়ামের কাছে হারার কী মানে হয়?

২০১২-র ফেব্রুয়ারিতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য প্রি-অলিম্পিক হকিতে যদি জিততে পারে ভারত, তাহলেই খুলে যাবে অলিম্পিকের দরজা। না হলে বেজিংয়ের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে। ফুটবলের কথা কহতব্য নয়। এশিয়ান কাপের জন্য অনেকরকম প্রস্তুতি, যাবতীয় সুযোগ-সুবিধে দিয়েও বাইচুং ভুটিয়ার দলের কাছ থেকে একরকম শূন্যতা, হতাশা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। সার্ক কাপ জেতার কারণে ন্যূনতম আদেখলাপনা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বিশ্ব ফুটবল দূরঅস্ত, এশিয়স্তরেই মূল স্রোতে যেতে পারে না। দলগত কোনও খেলাতেই ভারত আজ আন্তর্জাতিক মানচিত্রে বৃত্ত রচনা করতে পারছে না। অন্যদিকে শ্যুটিং তীরন্দাজি, বক্সিং, কুস্তি, গলফে কিন্তু ভারত জাতিক থেকে আন্তর্জাতিক হয়েছে।

শব্দরূপ-৬০৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

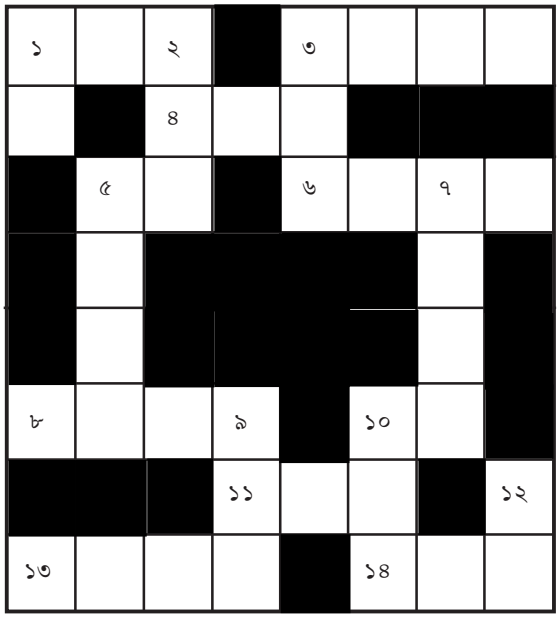

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. শুক্রাচার্য; পরশুরাম, **৩.** ভোজরাজের কন্যা, বিক্রমাদিত্যের মহিষী (ইন্দ্রজালনিপুণা), **৪.** সমুদ্রে বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস, **৫.** বৃষভানু-কন্যা; আয়ান-পত্নী, **৬.** শিব; একটি পাখি, **৮.** পরমেশ্বর, **১০.** বিজ্ঞান দিয়েছে—, কেড়ে নিয়েছে আবেগ, **১১.** দেবরাজ ইন্দ্র, **১৩.** যদুবংশের রাজা, বসুদেবের পিতা, **১৪.** মরীচিপুত্র, দেব দৈত্য প্রাণী ইত্যাদির জনক।

উপর-নীচ : ১. দীপ্তি; প্রাচীন কবি বিশেষ, শকুন, **২.** পৃথিবী, **৩.** কোপনা নারী, **৫.** যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, **৭.** গীতায় বর্ণিত সাধনপদ্ধতি, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মোন্নতি, **৯.** যম, কৃতান্ত, **১০.** নিঃশেষ, সমস্ত, **১২.** বড় মাদুর।

সমাধান
শব্দরূপ-৬০৫
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	দে	বী	প	ক্ষ	■	উ
গো	ম	য়	■	■	ণ	■	ত্ত
■	ণ্ড	■	■	■	দা	দ	রা
অ	ন	ড্ডা	ন	■	■	ণ্ড	■
■	মি	■	■	কী	র্তি	না	শা
আ	শ্র	ম	■	■	■	য়	■
দি	■	ঞ্জি	■	■	নে	ক	ড়ে
ত্য	■	স	ং	স্থি	তা	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬০৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ জানুয়ারী, ২০১২ সংখ্যায়

বীর সাভারকরের মুক্তি : বাজারি লেখকের কুৎসা কুযুক্তি

শিবাজী গুপ্ত

বাংলা ভাষায় 'বাজারি' কথাটা খুব শ্রদ্ধেয় উক্তি নয়— যেমন, 'বাজারি' মেয়েছেলে। পশ্চিমবঙ্গে এখন অনেক বাজারি সংবাদপত্র চলছে। তাদের চরিত্র পাঠকদের অজানা নয়। তেমনি এক বাজারি কাগজে গান্ধী হত্যা মামলায় বীর সাভারকরের বেকসুর খালাসে বিমর্ষ জনৈক পত্রলেখক সাভারকরের আন্দামান জেল থেকে মুক্তিলাভ প্রসঙ্গে কিছু বক্রোক্তি করেছেন। সে প্রেক্ষিতে দু' একটি কথা :

প্রথম কথা সাভারকর যে বলেছেন ভারত কেবলমাত্র হিন্দুদেরই পুণ্যভূমি এবং পিতৃভূমি; মুসলমান বা খৃস্টানদের নয়, তাদের পুণ্যভূমি সুদূর আরব ও প্যালেস্টাইনে অবস্থিত— এতে কি কোনও ভুল বা অতিরঞ্জন আছে? কোনও মুসলমান বা খৃস্টান কি কখনও 'বন্দেমাতরম্' বলে জন্মভূমির বন্দনা করে? তারা কি কখনও 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলে ভারতকে মনে করে? খুব সন্দেহ আছে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ মুচলেকা দিয়ে মুক্তি। ছল-বল-কৌশল রাজনীতিরই অঙ্গ। বিপক্ষের বিরুদ্ধে যখন যেটা প্রযোজ্য সেটাই প্রয়োগ করা হয়। সাভারকর দেখলেন দুই দফায় ২৫ বছর করে ৫০ বছর দ্বীপান্তর বাস। তার মানে সারা জীবনটাই বরবাদ। তাই তাঁর আদর্শ-পুরুষ শিবাজী মহারাজের নীতিই অনুসরণ করলেন। শিবাজী বাহ্যিক আনুগত্য দেখাতে ঔরঙ্গজেবের দরবারে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ঔরঙ্গজেব তাঁকে আটক করে রাখে। তখন শিবাজী অসুখের ভান করে ফল ও মিষ্টির ঝুড়িতে লুকিয়ে চম্পট দেন। সাভারকরও ভেবেছিলেন মিথ্যা আনুগত্যের শপথ ও মিষ্টি মিষ্টি চিঠি লিখে যদি একবার মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসা যায়, তা হলে জেলে থেকেও গোপনে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

কিন্তু ইংরেজরা সাভারকরকে ভালোভাবেই জানত। যখন অন্যান্য কয়েদীকে জেলের ভিতরে সেলের বাইরে আসতে দিত, তখন কিন্তু সাভারকরকে নির্জন কক্ষেই এগারো বছর কাটাতে হয়েছিল। ভারতের মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনার চিন্তা ইংরেজরা কখনও করেনি।

বরং সাভারকরের অনুশোচনা কতটুকু আন্তরিক তা যাচাই করতে একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে আন্দামানে পাঠাল। ১৯১৩ সালে তদানীন্তন ভাইসরয় কাউন্সিলের স্বরাষ্ট্রসচিব রেজিনল্ড ক্রেডোক সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তা সাভারকর

সম্পর্কে ইংরেজদের ভীতিকেই স্পষ্ট করে। তিনি লিখেছিলেন— ''সাভারকর কোনওরকম খেদ বা অনুশোচনা ব্যক্ত করেননি। সাভারকরকে আন্দামানেও কোনও প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, সে যে কোনও ভারতীয় জেল থেকে পালাতে পারে। আন্দামানের সেলুলার জেলের কুঠুরি থেকে বেরোতে দিলেই সাভারকর যে কোনও সময় পালিয়ে যাবে। তার দলের লোকেরা স্টীমার ভাড়া করে কোনও দ্বীপে লাগিয়ে দেবে এবং স্থানীয় লোকেদের ঘুষ দিয়ে বশ করে কাজ হাসিল করে নেবে।''

এজন্য ১১ বছরের কারাবাসে সাভারকর ভ্রাতাদের অন্যান্য কয়েদীকে যে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতো, তা তাঁদের দেওয়া হয়নি। এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বেশির ভাগ কয়েদীকে ক্ষমা করে মুক্তি দেওয়া হলেও সাভারকর ভাইদের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বলা হলো— ভাইসরয় সাভারকর ভাইদের ক্ষমা করতে রাজি ছিলেন না।

বীর সাভারকর তাঁর কথাবার্তায় বা পত্রে কী আশ্বাস দিয়েছিলেন তা ভেবে দেখা যাক। তিনি নিজে লিখেছেন, ''যখন কোনও অহিংস বা আইনগত পথে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, তখনই শুধু বৈপ্লবিক পথ অবলম্বন করে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত উন্নতি করতে হবে। যদি এখনকার সংস্কারের ফলে ভবিষ্যতে উন্নতি সম্ভব হয়, যে উদ্দেশ্যে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা যদি শান্তির পথে অর্জন করা যায়, তাহলে আমরা শান্তির পথেই চলব এবং রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

সাভারকর তারপরই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, সরকার আমার কথা হয়তো আদৌ বিশ্বাস করবে না। তিনি এরপর লিখেছেন, এই শর্তে কোনওরকম জটিলতা ছিল না। এর ভিত্তিতে আমাকে ইতিপূর্বে ছাড় দেওয়া হয়নি। এর কারণ, আমার কথার মধ্যেই বিপ্লবী আন্দোলনের লক্ষ্য, অনুগামীদের কথা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু আমি আমার শর্তে স্থির ছিলাম। আমার অতীত কার্যকলাপ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। অতীতে যা হয়েছে তা হয়েছে। ভবিষ্যতের কথা বলুন।''

এটা ছিল ১৯২৩ সালের কথা। এখানে অন্যায়ের কি আছে? এর থেকে কি এই সিদ্ধান্তে কি আসা যায় যে, সেলুলার জেল থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন সরকারকে মুচলেকা দিয়ে? সাভারকর ভাইদের মুক্তির জন্য আবেদন ও দাবি জোরদার হলে বাধ্য হয়ে তাদের মূল ভূখণ্ডে আনা হয়। কলকাতা, নাসিক, পুণের জেলে রাখার পর তাঁদের রত্নগিরিতে নজরবন্দী করা হয়। তখন তাঁরা সেখানেই সমাজসেবার কাজ শুরু করে দেন। তাঁদের মুক্তির জন্য পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়। ক্ষুব্ধ বৃটিশ সরকার সাভারকরের কাছে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য জানতে চায়। সাভারকর যে জবাব দেন, তাতে তাঁর বুদ্ধি চাতুর্যের পরিচয় মেলে। তা থেকে মোটেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যে, সাভারকরের মন ভেঙে পড়েছিল।

বাজারি কাগজের কলমচীদের পক্ষে বীর সাভারকরের কর্মমুখর জীবনের মূল্যায়ন করতে যাওয়া ঝিনুক দিয়ে সমুদ্রের জল সেঁচার মতোই হাস্যকর।

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ৫

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)